দুখিয়ার কুঠি

অমিয়ভূষণ মজুমদার

নিও-লিট পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১নং কলেজ রো, কলিকাতা—৯

নিও-লিট পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে
শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাস কর্তৃক ২১৩, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক সিংহ
প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২১, সাতানাথ বসু লেন,
সালকিয়া হাওড়া, হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী
গণেশ বসু

মূল্য : ৩·০০

আমার গল্পের আদি পাঠক

আমার মাকে—

ভূমিকায় এইটুকু বলা উচিত যে উপন্যাসটির সমস্ত ঘটনাই কল্পনা প্রসূত। এমন কি কোন বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলকেও পটভূমি হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে না।

মানুষের অনিবার্য সম্মুখবেগেও একটি বেদনা লুকানো থাকতে পারে, এর বেশি কিছু বলার নেই।

পটভূমিকে পরিচিত সভ্যতার প্রান্তে স্থাপন করার তাগিদে একটি আঞ্চলিক ভাষার ধাঁচ কথোপকথনে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাবে পদগুলির সঙ্গে সমার্থক বাংলা পদের মৌল পার্থক্য নেই। বিভক্তি অনুসর্গ প্রভৃতির প্রয়োগেই আকৃতিটা নতুন দেখায়। বিশেষ্যে বিভক্তিগত পার্থক্যের ফলে রামকে=রামক্, রামের=রামর। পঞ্চমী বাচক অনুসর্গ থেকে=থাকি। অধিকরণে গাছে=গছং। তুলনীয় নিচে=নিচং।

ক্রিয়ার রূপেই পার্থক্যটা বেশি দেখা যায়। অসমাপিকা খেয়ে=খায়া, গিয়ে যায়া। তুমার্থক 'ইতে' প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে হাসিতে=হাসির, যেতে=যাবার, যাওয়ার, দিতে=দিবার।

বিভিন্ন কালে ক্রিয়াবিভক্তিগত পার্থক্যের ফল এই রকম দাঁড়ায়—

সাধারণ বর্তমান.—কই = কং, দিই=দেং।

ঘটমান বর্তমান ধর্ ও লাগ্ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়। যেমন দিচ্ছি দিবার ধরছং, শুনছে শোনার লাগছে।

পুরাঘটিত বর্তমান এবং সাধারণ অতীতে পার্থক্য সব সময়ে স্পষ্ট নয়। তা হ'লেও গিয়েছি গেইছং, দিয়েছি=দিছং, গিয়েছে=গেইছে, ধরেছে=ধরছে। গিয়েছিলে - গিছলু, গিয়েছিলাম=গিছনু, ধরলো, ধরেছিলো=ধরিল্, ধরলেক, গেলো, গিয়েছিলো= গেইল, গেইলেক।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে উত্তমপুরুষে 'ইম্' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, যাবো=যাইম্, করবো=করিম্। কখনও কখনও দেব= দ্যাঁও। অন্যত্র যাবি যাবু, যাবে=যাইবে।

নঙার্থক পদখণ্ড ক্রিয়ার পরে না ব'সে আগে বসে। যেমন, না কং, নাই দেখং, নোয়ায় (=না+হয়); কিন্তু দেখিই না, যাই-ই না প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখওে না, যাওে না। লক্ষণীয় গুরুত্ব বোধক 'ই' 'এ' তে পরিবর্তিত।

স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'টে' অনুসর্গের মতো ব্যবহার হয়। যেমন, কোথায়=কোটে, যেথায়=যেটে। কালবাচক এখন=এলা, যখন=যেলা।

অন্যত্র তবু=ত্যাও, তো=তা, ত্যা।

বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকু দেয়া দরকার ছিলো।

অমিয়ভূষণ মজুমদার

মহকুমার সদর গদাধরপুর। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচশ' ছিয়াত্তর।

মহকুমা-অধিপতির পদবী নায়েব আহিলকার। তিনি রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ হিসাবে শাসক এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারক। স্বভাবতই তিনি শহরের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করছেন।

শহরের একমাত্র বাঁধানো পথের দৈর্ঘ আধমাইল পরিমাণ। লাল সুরকির পথ বেমেরামতের ফলে ঝামা ও ইটের টুকরোয় খরখরে। উদ্বোধনের দিনে তার দু'পাশে যে দেবদারুগাছগুলো লাগানো হয়েছিলো তারই কয়েকটি বিরলপত্র অবস্থায় বেঁচে আছে। কি একটা কারণে কাণ্ডগুলি বাঁকা বাঁকা ও অর্বুদযুক্ত।

কাঠের পাটাতন, তারই দেয়াল এবং টিনের ছাদের চার-কামরার যে বাংলোটায় নায়েব আহিলকার বাস করেন পাকা রাস্তাটা তার সম্মুখ থেকে সুরু হ'য়ে ফাঁকা একটা মাঠের উপর দিয়ে মহকুমা-দপ্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। লাল রং-এর এই নিচু গড়নের দপ্তরটি যেমন শহরের একমাত্র পাকা বাড়ি তেমনি দেয়ালের সবুজ রং কালিয়ে যাওয়া, টিনের লাল রং বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলোটিই সব চাইতে জমকালো স্থাপত্য নিদর্শন। দপ্তরের বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন বিভাগ; দক্ষিণ কোণের ঘরে লাল সালু দিয়ে ঘেরা বিচারমঞ্চ, এবং সাক্ষী ও আসামীর কাঠগড়া সমেত এজলাস। উত্তর কোণের ঘরটিতে একাংশে

লোহার শিক দিয়ে পৃথক-করা হাজত, অন্য অংশে দেয়ালের গায়ে হাতকড়া-ঝোলানো পুলিশ-অফিস ও থানা। একজন সব-ইনস্পেক্টর, জন দু'এক মুন্সি, জন পাঁচেক কনষ্টেবল নিয়ে মহকুমার পুলিশ বিভাগের সদর দপ্তর।

দপ্তরের চারিদিকে ঘাসে ঢাকা ঢেউতোলা মাঠ। ঘাসগুলো দূর্বাজাতীয় কিন্তু রোদে পুড়ে শক্ত ও কর্কশ হ'য়ে যেন জাত বদলাচ্ছে।

দপ্তরের পিছন দিকে এবং তার থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে মূল শহর সুরু হয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে যে জায়গাটুকুতে তাকে ঘিরে একটা মাটির পথ চ'লে গেছে। এই পথের উপরেই শহরের সবকয়টি উল্লেখযোগ্য বাসিন্দার বাড়ি। উল্লেখযোগ্য বলতে নায়েব আহিলকারের দপ্তরের পাঁচ সাতজন আমলা-পেয়াদা, পুলিশের লোক কয়েকটি, তিনজন উকীল, জন দু-তিন মোক্তার এবং কয়েকজন দোকানদার।

এরা ছাড়া যারা আছে তাদের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য বদন মাষ্টার। সে এক দোকানদারের বাড়িতে থাকে। বছর দশেক হ'লো সে এই শহরে এসেছে। সংসার সম্বন্ধে তার সন্ন্যাসীর মতো অনাসক্তি। অতীত জীবন সম্বন্ধে সে পাষাণের মতো নির্বাক। তার বুকে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্নের শুকনো দাগ আছে। ছেলেরা সেজন্য তাকে ভয় পায়। শহরের ছেলেদের কয়েকটিকে সে দু'বেলা পড়ায়।

দোকানীদের মধ্যে গোঁসাইদের দুই শরিকই মহাজন নামে পরিচিত। দোকান বলতে সাজানো-গোছানো ক্রেতার নয়নাভিরাম কিছু নয়, বরং যেন গুদামের মতো। দড়ি-দড়া, লোহালক্কড়, আলকাতরা ও গুড়ের টিন যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় চাল-ডাল, মসলা, কাপড়চোপড়। খোঁজ করলে কলঙ্কধরা

ছু'একটা বাসনও ক্রেতা কিনতে পারে।

গোঁসাইদের বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূরে গেলে রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের মাথায় একটা ছোটো দোকান উঠেছে কয়েক বছর আগে। কিছু কিছু পেটেণ্ট ওষুধ কিনতে পাওয়া যায় সেখানে। শহরে কম্পাউণ্ডারি করেছে এমন একজন লোক এই দোকানের মালিক। সেই এই শহরের একমাত্র ডাক্তার।

প্রকৃতপক্ষে শহর এখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এই পথের ধারেই কিছু দূর এগিয়ে গেলে একটা নতুন ইটের বাড়ি উঠছে। প্রথম দিকে লোকের কৌতূহল অত্যুগ্র হয়েছিলো। বাড়িটা কিন্তু দেখ-দেখ ক'রে গ'ড়ে উঠলো না। লোকের কৌতূহলও মিইয়ে এসেছে। এই বাড়িটা চক্রবর্তীর। বয়স্ক লোকেরা তাকে লখাই বলে। সরকারী কাগজপত্রে তার নাম লক্ষ্মীশ্বর চক্রবর্তী। সে নাকি কনট্রাক্টর। তার দেখা পাওয়া ভার।

স্কুল নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বেশ্যালয় আছে। গদাধর নদীর ঘাট থেকে রাস্তায় পৌঁছানোর আগেই একটা ছোটো দোকান। দিশী প্রথায় বসানো কাঁচা ছুধের দৈ, চিড়েমুড়ি পান-বিড়ি, ইদানীং চা নামে এক রকমের তরল পদার্থ পর্যন্ত বিক্রি হয়। এই দোকানটার পাশ দিয়ে সরবন ও বনঝাউ-এর মধ্যে দিয়ে যে সরু পথটি গেছে সেটার শেষে ছু'তিনখানি ঘর। ছু'জন বারনারী বাস করে সেখানে। এখানকার সব ব্যবসায়ের মতো তাদের ব্যবসাও হাটের দিনের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু ব্যবসায়ে মন্দা চলেছে। ধানের গত ফসল ভালো হয়নি। এদিকে শহরের এক গৃহিণী নানা শাস্তি দেবে ব'লে শাসিয়েছে। কবে কার শখ হবে তারই প্রতীক্ষা করছে তারা সংকীর্ণ হ'য়ে। অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিয়েছে।

ধুলো-ধুলো-ধুলো। বর্ষার ছু'মাস পর থেকে ধুলো সুরু হ'য়ে ক্রমশ সেটা বাড়তে থাকে। নায়েব আহিলকারের দপ্তরের খাতাপত্র,

এজলাসের সালু, গোঁসাইদের দোকানের পণ্য, ওষুধের দোকানের শিশিগুলি—সর্বত্র ধুলোর আবরণ প'ড়ে যায়। তারপর আসে বর্ষা। কাদা-কাদা। কাঁচা রাস্তাগুলিতে গোরু-গাড়ির চাকায় গর্ত হ'য়ে যায়, সেখানে জল জমে। বাড়িগুলোর সামনে কোথাও ড্রেন নেই। অন্যান্য ঋতুতে ব্যবহৃত জল শুকনো মাটিতে শুষে যায়। বর্ষায় তা হয় না। রোদ উঠলে জমা জলের সর পড়ে বুদ্বুদ ওঠে। বাড়িগুলির খাটা পায়খানার গন্ধ ছড়াতে থাকে। কারণ দূর শহর থেকে পনর দিনে একবার ক'রে যে মেথরটি অন্য সময়ে আসে বর্ষার কয়েক মাস তার দেখা পাওয়া যায় না।

কেন এই শহর তৈরি হ'য়েছিলো এ নিয়ে নানা রকমের মত আছে। আগে এ-অঞ্চল সদর মহকুমারই এক শাসন-বহির্ভূত অংশ ছিলো। একদা এ অঞ্চলে জরিপ হয়েছিলো। জরিপকর্তার বাসের জন্য বাংলো উঠেছিলো, এবং তার আমলা-পেয়াদাদের বাসের জন্য এবং কাজকর্মের জন্যও বটে একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিলো। বর্তমানে এদু'টিই যথাক্রমে নায়েব আহিলকারের বাসভবন ও দপ্তর। কিন্তু তৈরি দুটি বাড়ি পাওয়া গিয়েছিলো ব'লেই মহকুমা হিসাবে এ-অঞ্চলকে পৃথক করা হয়নি। মূলত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় অধিকতর খাজনা আদায়ের ইচ্ছা থাকলেও শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টাও ছিলো পরিকল্পনায়। শহরের পথটা সুরকি দিয়ে যারা বাঁধাতে সুরু করেছিলো অন্তত তাদের সম্বন্ধে এ রকম একটা চিন্তা করা যায়। কিন্তু পথের ধারে দেবদারু গাছ লাগানোর পরে যেমন রাজকীয় দৃষ্টি অন্যদিকে স'রে গিয়েছিলো, গোটা মহকুমার ব্যাপারেও হয়তো তাই ঘ'টে থাকবে।

তথাপি একটা শহর বিশ-ত্রিশ বছর ধ'রে টিঁকে গেলে আশা করা যায় হয়তো সেটা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। অন্তত হালফিল কোন কোন বিষয় থেকে এ রকম একটা আন্দাজ হয় যে

গদাধরপুর তার যৌবনদশার দিকে এগোচ্ছে। এ ধরণের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পিচঢালা পথ দিয়ে সদর মহকুমার সঙ্গে গদাধরপুরকে সংযুক্ত করার চেষ্টা। নদীর ওপারে শহর থেকে দশ পনরো মাইল দূরে মাটি তুলে রাস্তা চওড়া করার কাজ চলেছে এখন, তারও মাইল দু'এক পিছনে পাথর পড়েছে রাস্তায়, কুচো পাথর আর পিচে মিশিয়ে ঢালবার যন্ত্রও এসে গিয়েছে।

নদীটার ঠিক ও-পারেই দুখজাগানিয়ার কুঠি। চলতি ভাষায় দুখিয়ার কুঠি বলে লোকে। অর্বাচীন নোঙরা মহকুমা শহরটার নাম গদাধরপুর হওয়ার মধ্যে কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য নেই, নদীর নাম থেকে সেটা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পাবে গদাধর কেন নাম হ'লো নদীটার। দশ বার হাত পরিসর একটি জলধারা চওড়া কিন্তু অগভীর খাতে ব'য়ে যাচ্ছে। বর্ষায় কাদা-গোলা জলের ঢল নামে, অন্য সময়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। অবশ্য সারা বছরই কিছু জল থাকে এবং তা থেকে মনে হয় কুলের দিক দিয়ে হয়তো হিমালয়ের আভিজাত্য এরও আছে। তীরে বেতের ঝোঁপই অধিকাংশ জায়গায়, যেখানে বর্ষায় পার ছাপিয়ে ওঠে জল সেখানে বন ঝাউ এবং সরবন। নদীর নাম বেত্রবতী, কিংবা সরস্বতী হ'তে পারতো। নামকরণ সম্বন্ধে কৌতূহল সার্থক ব'লেই মনে হয়। দক্ষিণ বঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করছেন তার প্রায় সমসাময়িক কালেই আসাম এবং উত্তর বঙ্গেও বৈষ্ণবধর্মের প্রচার হচ্ছিলো; সাহিত্য গ'ড়ে উঠছিলো; বিভিন্ন মোঙ্গলীয় কৌমের যে লোকেরা এসে ভারতের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে অহম নাম নিয়ে বসবাস করতে সুরু করেছিলো, ধর্মচিন্তার ঐক্য দিয়ে তাদের একটি জাতিতে

পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি পরিবর্ত্তনেরও চেষ্টা হয়েছিলো। উপাস্য বিষ্ণুর নাম থেকেই স্বাভাবিকভাবেই এই নদীটির নামকরণ হ'য়ে থাকবে। এবং এর জলধারায় সে নাম ভেসে এসে উভয় তীরের আদিবাসিন্দাদের মধ্যেও সেই নবীন ধর্মের কিছু কিছু প্রচার করেছিলো। নতুবা এ-অঞ্চলের ভাষার স্বাভাবিক যে প্রবণতা আছে, যার ফলে নদীর নাম হয় দোলং কিংবা তোরসা, তারই ফলে হয়তো এই ধারাটির নামও মাতালিয়া অথবা আই হ'তে পারতো।

পক্ষান্তরে দুখজাগানিয়ার কুঠি একান্তভাবেই আদিবাসিন্দাদের দেয়া নাম।

নামটা ষাট-সত্তর বছরের কিংবা তারও বেশী পুরনো। তার আগেও এ সব অঞ্চলে লোকের বসতি ছিলো। প্রবাদ এই, এক রাজকুমারের উপরে এ-অঞ্চলের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিলো। সে সময়ে উত্তরবঙ্গে ভোট বা ভুটিয়াদের কিছু প্রাধান্য হয়েছিলো। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতো, ডাকাতি করতো, রাজার সৈন্যদলের সঙ্গেও যুদ্ধ করতো। এমনকি একবার এক রাজাকে বন্দী ক'রে ভোট-দেশে নিয়েও গিয়েছিলো। ইতিহাস-কাহিনীতে শোনা যায় ভোটদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই ইংরেজ-কোম্পানির শরণ নিয়েছিলো রাজা। কাজেই ধ'রে নেয়া যায়, যার উপরে এ-অঞ্চলের শাসনভার থাকতো তার জীবনটা খুব একটা শান্তির ছিলোনা সাধারণভাবে বলতে গেলে। সে যাই হ'ক ইংরেজ কোম্পানির ঘোড়ায় টানা কামানের মুখে প'ড়ে ভোটরা যখন পালালো তখন রাজ্যের প্রায় আধখানা কোম্পানির সৈন্য-দলের ভরণপোষণের জন্য কোম্পানির হাতে তুলে দিয়ে রাজার জীবনে কিছু শান্তি এসেছিলো, সুতরাং সৈন্য সামন্তদের জীবনেও।

প্রবাদ এই, ভোটদের এক অভিযাত্রী দল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন

হ'য়ে এ-অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে আত্মগোপন করেছিলো। তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য উদ্যোগ প্রচেষ্টা করেছিলো কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা গদাধরের তীরে একখানি ভোট গ্রামের পত্তন করেছে। তখনকার দিনে সব-জাতের সৈন্যদলের মতো এদের সঙ্গেও কিছু পরিমাণে নারী ছিলো, কিছু খচ্চর পনি ছিলো। গ্রামের পত্তন হওয়ার পর নারীরা গৃহেরও পত্তন করলো। এ বিষয়ে একটা সুবিধা ছিলো যে এক নারীর পক্ষে পঞ্চস্বামীর ঘর করার বিধান ছিলো তাদের মধ্যে। কিন্তু অসুবিধা ছিলো এই পুরুষরা চাষ আবাদ করতে একেবারেই রাজী হ'লোনা, বরং কোমরে ঝোলানো দেড়হাত লম্বা তরোয়াল ও তীরধনুকের সাহায্যে চারিদিকের গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় যা কিছু সংগ্রহ করাকে তারা স্বাভাবিক মনে করেছিলো। এ পদ্ধতিতে কিছুদিন বেশ ভালোই থাকা যায়, তারপরে অবশ্য কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়; ক্রমাগত লুট করতে থাকলে মাটি-কামড়ে-থাকা কৃষকের মনেও ধিক্কার জন্মায়, সে জমিতে মন দিতে পারে না; তা ছাড়া লুটের সময়ে শস্যের অপচয়ও হয়; এর ফলে ভোটদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিলো। উপরন্তু তাদের হাতের কাছে ইস্পাত ছিলোনা, কারিগরও ছিলোনা তাদের মধ্যে; ফলে তাদের তরোয়াল মরচে প'ড়ে অব্যবহার্য হ'য়ে গেলেও সেগুলিকে বদলে নেয়া গেলোনা। আর শেষ কথা এই যে পঞ্চস্বামীর ঘরণীরা বোধ হয় কোন কারণে পঞ্চপুত্রবতী হয় না, বস্তুত ভোটদের লোকসংখ্যা বিশ বছর পরেও খুব একটা বৃদ্ধি হয়নি, যদিও তাদের শস্যভাণ্ডার স্বরূপ গ্রামগুলিতে অনেক আদিবাসী নারীর সন্তানের আকৃতিতে ভোটত্বের ছাপ পড়েছিলো।

ঠিক এরকম সময়েই এ-অঞ্চলের শাসনকর্তার পরিবর্তন হয়েছিলো। বুড়ো রাজকুমারের মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবক শিরোপা এবং কামদার চোগা খিলাৎ পেয়েছে রাজার কাছে

নিয়োগ-নিদর্শন হিসাবে। বিজয়া দশমীর সকালে পাটহাতীব পিঠে ব'সে রাজগুরু খঞ্জন পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলো। শবতে দিগ্বিজয় যাত্রা, তার দিগ্ নির্ণয় করে খঞ্জন পাখির গতি। এবাবে খঞ্জন সোজাসুজি পূবদিকে উড়ে গিয়েছিলো। প্রয়োজনের চাইতে প্রথা বড়। কিন্তু এবাব রাজা-মহাশয়েব কোলকাতায় যাওয়ার কথা ছিলো, কাজেই পুবদিকের জঙ্গলে শিকার অভিযান ক'বেও রক্তপাত করার উৎসাহ ছিলো না তাঁর। সুতরাং খঞ্জনেব গতিপথে ধাবিত হ'লেন নবনিযুক্ত যুবক প্রদেশপাল। সঙ্গে চললো বিসালদাব রামদীন শুক্ল, বিসালদার-মেজব হেদায়েৎ আলি খান এবং সত্তব আশি জন ঘোড়সওয়ার।

পুবের জঙ্গলে শিকার চললো তিনদিন ধ'রে। চতুর্থ দিনে যে ঘটনা ঘটে গেলো তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলো না। জঙ্গলটার পারেই ভোটদের বস্তি। বামদীন শুক্লের এক ঘোড়সওয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ক্রীড়ারত এক ভোটদম্পতিকে দেখতে পায় এবং রাক্ষস মতে ভোট-নারীকে গ্রহণের চেষ্টা করে। ভোটপুরুষটির তরোয়াল অত্যন্ত পুরনো কিন্তু তার সাহায্যেই সে ঘোড়ার একটা কান কেটে দিয়েছিলো এবং সওয়ারের কপালে একটা গাছের ডাল ছুঁড়ে মেরে দিয়েছিলো। খবরাখবর হওয়ার পরে বেলা বারোটা আন্দাজ রিসালদারেরা প্রদেশপালের দেহরক্ষার জন্য জন পঁচিশেক ঘোড়সওয়ার রেখে বাকি সৈন্য নিয়ে ভোটবস্তির সম্মুখে গিয়ে পৌঁছালো। পঞ্চাশজন বালক-যুবক ও বৃদ্ধ ভোট তাদের ঘরগুলিকে আড়ালে রাখবার জন্য বস্তির সম্মুখে সারিবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। শক্রতা বংশপরম্পরায় চ'লে আসা ঐতিহ্য। সকালের দ্বৈত-সংঘাতের ঘটনাটা তাকে জীবন্ত ক'রে দিয়েছে। যুদ্ধ-ঘোষণার প্রয়োজন ছিলো না, দেখা মাত্রই সুরু হ'য়ে গেলো। দৈহিক শক্তি ও জীর্ণ তরোয়াল, অব্যবহারে বেঁকে যাওয়া তীরধনুক নিয়ে ভোটরা ; এদিকে

ঝকঝকে তরোয়াল, আর কোম্পানির কাছে কেনা বন্দুক। ভোটদের কয়েকটি পনি অবশিষ্ট ছিলো। বিশ ত্রিশ মিনিট ধ'রে বস্তি রক্ষার চেষ্টা ক'রে ছড়িয়ে পড়লো ভোটরা। তিনদিন তিনরাত ধ'রে চললো ছুটোছুটির যুদ্ধ। রাজসৈন্যদল অবশেষে বিজয়ী হ'লো।

তখন মৃতাবশিষ্ট ভোটরা পুব-উত্তর লক্ষ্য ক'রে রাজ্যের সীমা ছেড়ে পালিয়েছে। তাদের বস্তিকে কেন্দ্র ক'রে চার পাঁচ মাইলের মধ্যে অন্তত চল্লিশজন ভোটের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বিজয়ের সন্ধ্যায় প্রদেশপালের স্কন্দাবারের সম্মুখে একটা মোটা রশিতে বাঁধা জন পনর ভোটনারীকে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলো। রশির মাথা দু'টি হাতি বাঁধবার খোঁটায় জড়ানো। দূরে দূরে আগুন জ্বলছে। সেগুলি যুদ্ধে হত রাজসৈন্যের চিতা। কতগুলি চিতার আগুন অপেক্ষাকৃত প্রবল সেগুলিতে পুড়ছে মৃত ভোটদের দেহাবশেষ। যুদ্ধে তারা ছোটো ছোটো দলে সংঘবদ্ধ হ'য়ে মরেছে, এখনও যেন সংঘবদ্ধতা বজায় আছে।

ভোটরা নির্মূল হ'লো। এ রকম মনে করার যুক্তি আছে তাদের বস্তির চাবিপাশের গ্রামেব অধিবাসীদের তুলনায় তারা অগ্রসর ছিলো। তাদের সভ্যতার কোন নিদর্শন অবশ্য এ-অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়তো বা তাদের সমাজের কোন প্রথা বর্তমানে আঞ্চলিক কোন সংস্কাবের গোড়ায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একটা বিষয়ে তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন কখন কখন চোখে পড়ে। এদিকের ইতস্তত ছড়ানো গ্রামগুলিতে মোঙ্গলীয় ছাঁদের মুখাকৃতি পাওয়া যায়। আর ভোট বস্তিটার সীমার মধ্যে পড়ে যে গ্রামটা গ'ড়ে উঠেছিলো সেখানে কিছু গৌরবর্ণেব-স্ত্রীপুরুষের সন্ধান পাওয়া যেতো। এই গ্রামেরই বর্তমান নাম দুখিয়ার কুঠি। প্রদেশপাল যুদ্ধ জয় ক'রে এই আকস্মিক ভাগ্যোদয়ের জন্য বাণেশ্বর মহাদেবকে সহস্রবাব ধন্যবাদ দিতে দিতে রাজধানীতে ফিরে গিয়েছিলো।

চারিদিকে কোম্পানির রাজত্ব, এ পরিস্থিতিতে এমন একটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই সব রাজপুরুষের ভাগ্যে ঘটে না।

কিন্তু দুখিয়ার কুঠির বেদনাটা ভোটদের স্মৃতি বহন করছে কিংবা আরও পরবর্তী কালের, এ বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে।

প্রদেশপাল বছরে একবার এ-অঞ্চলে শিকারে আসতেন এবং তদুপলক্ষে এই গ্রামে বাস করতেন। এটা বোধ হয় পৃথিবীর পক্ষে ভালো যে তাঁর বাসভবনের কোন ধ্বংসাবশেষ এখানে অন্তত প্রকৃতিকে কদর্য ক'রে রাখে নি। তার স্কন্দাবার তৈরি হয়েছিলো বাঁশের চাঁচারি দিয়ে। হাতির দাঁতের মতো হলদেটে রঙের সূক্ষ্ম জালির কারুকার্য করা বাঁশের দেয়াল, কাছে থেকে দেখেও মর্মরের কারুকুশলতার তুলনীয় ব'লে মনে হ'তো। আর সেই স্কন্দাবারের অভ্যন্তরে গালিচা ঢাকা মেঝেতে মদিরেক্ষণা নর্তকীদের ললিত হিল্লোলিত অবয়বের প্রতিচ্ছবি যথারীতি মৃত্যু ও অবসানের জটিল নৃত্যনাট্যের অঙ্কগুলি দেয়ালের গায়ে রচনা করতো। আলোকমুখী রাজপুরুষ এবং তার সহচররা রমণীয় দেহগুলির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে স্বভাবতই তার কোন সংবাদই রাখেনি। এক বসন্তে সেই লীলাস্থলে এলো মৃত্যু। গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাওয়ারও সময় পেলোনা। ভয়ার্ত মানুষরা যত পালানোর চেষ্টা করলো ব্যাধির জাল তার তুলনায় অনেক দ্রুত বিস্তৃত হ'লো। যে নগর গ'ড়ে উঠছিলো সেই কুঠির চারিদিকে সেটা গেল ফৌৎ হ'য়ে। কুঠিটা তারপরেও কয়েক বছর দাঁড়িয়েছিলো। দূর থেকে দেখলে লোকের মনে দুঃখ জাগতো। দুখ-জাগানিয়ার কুঠি। সভ্যতার একটা জোয়ার যেন সেই দ্বিতীয়বার এ অঞ্চলকে স্পর্শ ক'রে গিয়েছিলো।

॥ দুই ॥

তার আসল নাম মাতালু ধনী, কিন্তু গোঁসাইরা তাকে স্নেহ ক'রে একটি নাম দিয়েছে—বটেশ্বর দাস। নিজ গ্রামে সে এখনও মাতালু ব'লেই পরিচিত। কিন্তু জমি-জমার কাগজপত্রে আজকাল কখন কখন ইশাদী হিসাবে, ক্রেতা-বিক্রেতা রূপেও তার নাম লেখা হচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে সে বটেশ্বর ব'লে উল্লিখিত হয়, কিন্তু দাস কথাটা তার ভালো লাগে নি ব'লে উপাধি হিসাবে 'ধনী' টাকেই সে বহাল রেখেছে।

তার বয়স কুড়ি বছব হ'লো এবার। পাহাড়ীদের যেমন হয় তেমনি গেঁটে-গেঁটে ডিম-ডিম হাত-পা। কিন্তু গড়নটা দীর্ঘ। গায়ের রং তামাটের চাইতে বরং হলদের দিকে ঘেঁষা। নাক ও ঠোঁট কিছু বিস্তৃত। কিন্তু ভ্রূ ও চোখ দুটি বড়ো সুন্দর। ভারি সুরেলা তার কণ্ঠ। খালি গায়ে বুকখোলা ছিটের কোট, মাথায় জড়ানো লাল চৌখুপির নকশা-তোলা এণ্ডিব চাদর। পায়ের নতুন রবাবের জুতো হাতে উঠেছে।

মাতালু গদাধবপুর থেকে দুখিয়ার কুঠিতে যাচ্ছে। খেয়াঘাটের কাছে এসে তার মনে পড়লো সকালে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পাব হ'য়েও ইজারাদারকে চারটে পয়সা দিতে হ'য়েছিল। যে নৌকা বেয়ে পার করে তাকে পয়সা দিতে কেউ আপত্তি করে না, কিন্তু তুমি ঘাট ডেকেছ ব'লেই তোমার এমন অধিকার জন্মায় না যে

নৌকা চলার মতো জল নেই তাই বনের বাঁশ কেটে এনে সাঁকো বানাবে, আর সেই সাঁকো দিয়ে যেই পার হবে তার কাছ থেকে পারানি পয়সা নেবে। এ এক নতুন প্রথা চলেচে এ দেশে। সুতরাং এই অন্যায় থেকে স'রে যাওয়ার জন্য মাতালু খানিকটা উজিয়ে গিয়ে পায়ে হেঁটে পার হওয়ার জন্য নদীতে নামলো। ইজারাদারের লোকরা পয়সা না-দিয়ে নদী পার হওয়ায় ব্যাপারটার প্রতিবাদ হিসাবে হৈ-হৈ ক'রে চিৎকার করলো। মাতালু বুঝতে পেরে কৌতুক অনুভব ক'রে ঐ-ঐ ব'লে তাদের ব্যঙ্গ করলো।

ওপারে উঠে ইজারাদারকে জব্দ করার প্রায় বালকোচিত একটা আনন্দে মাতালুর মুখ আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উটলো।

কিন্তু ইজারাদারের তুলনায় অধিকতর আকর্ষণীয় অনেক কিছুই পৃথিবীতে আছে। সে যেখানটায় নদীপার হয়েছে তার কিছু দূরেই বারনারীদের ঘরগুলি। সে দেখলো দু'জন মেয়েমানুষ স্নান করতে নামছে। এরকম পরিস্থিতিতে পুরুষদের দূরে স'রে যাওয়াই বিধান। মাতালুও পথের দিকে চোখ রেখে চ'লে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো কিন্তু নতুনত্বের একটা বিস্ময় তাকে কয়েক মুহূর্ত আটকে রাখলো। মেয়ে দুটি তীরে কাপড় রেখে প্রায় নিরাবরণ হ'য়ে জলে নামলো। মাতালু যদি বাঁয়ের দিকে লক্ষ্য করতো সে দেখতে পেতো ইজারা-দারের পারানি আদায়ের টোং-এর কাছে চার পাঁচটি পুরুষ মেয়ে দুটির দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে আছে। মাতালুর মনে পড়লো জলপরীরা এ রকম ক'রে স্নান করে এ গল্প সে শুনেছে, কিন্তু দিবা-দ্বিপ্রহরে গদাধর নদীর ধারে জলপরী আসা সম্ভব নয়; এরা নিশ্চয়ই বিদেশী স্ত্রীলোক, যাদের কথা দুখজাগানিয়ার কোন-কোন পুরুষ আড়ে-ঠারে আলাপ করে এরা হয়তো তারাই।

বনঝাউ-এর জঙ্গলটা পার হ'য়ে চলাচলের পথে উঠে মাতালু একটা অনির্দিষ্ট ক্ষুধার মতো কিছু অনুভব করলো। কিন্তু সে ক্ষুধায়

ক্ষিপ্রতা ছিলোনা, রূপকথায় শোনা অনেক রূপসী নারীর কথা তার মনে পড়লো।

সে শহরে এসেছিলো সাক্ষী দিতে গোঁসাইদের শরিকানি মামলায়। বড়ো গোঁসাই মাস দু'এক হ'লো স্বর্গারোহণ করেছে, মামলাটা সে ঘটনার মাস দু'এক পর থেকেই বাধব বাধব ক'রে এতদিনে আদালতে উঠলো। মাতালুর মা বড়ো আই বা ডাঙ্গর আই তাকে নিষেধ করেছিলো মামলার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে কিন্তু মাতালু সে নিষেধ মানতে পারে নি।

ইতিমধ্যে মাতালু দুখিয়ার কুঠির সীমান্তে এসে পড়েছিলো। এবং তার বন্ধু কাঁকরুর সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেলো। কাঁকরু বয়সে কিছু বড়ো। মাতালুর বেশভূষার অনন্যসাধারণতা কুঁাকরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে বললো, 'বাপুরে, সাহেব মানসি! কোর্টে গিছলেন, বাহে ?'

'কোটে।'

'কোটে কোটে?' কাঁকরু কোর্ট কথাটা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞাসা করলো।

কোট, যাক কয় আদালৎ।'

কাঁকরুর সহজাত হাস্যরসবোধ প্রকাশিত হলো। সে যমক দিয়ে বললো 'গায়ৎ পিন্ধছেন কোট। গেইছেন কোটে ? না কোটে। বাপুরে তোমরা কোটবাবু হইছেন দেখং।'

রসিকতাটা মাতালুর খুব ভালো লাগলো, সেও হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

গোঁসাইদের মামলার কথা কাঁকরু কিছু কিছু জানতো এবং মাতালুকে যে উভয় পক্ষই তালিম দিচ্ছে সে সংবাদও তার কানে এসেছিলো। বিষয়টাতে সেই প্রথমে অস্বস্তিবোধ ক'রে ডাঙ্গর আইকে জানিয়েছিলো। অন্যের ব্যাপারে লেগে থাকা স্বভাব নয় ব'লেই

পরে অবশ্য এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি সে।

কাঁকরু বলল, 'ভাটিয়ারা মামলা কবছে, তুই গেলু কেনে?

'করিম কি তা কও। মুই তো এদি-উদি দেখবার লাগলং তো পিয়াদা হাঁকি দিলেক, বটেশ্বব দাস হাজির। মুই কিছু কঙে না। তিনে বার হাঁকি দিলেক, তঁ্যাও কিছু কঙে না। তাব পাছৎ উকীল আসি কয়, বটেশ্বর তোমাকে ডাকিব লাগছে শোনেন নাই। গেইলং উকীলের পাছে। কি বেজলাস! (কথাটা এজলাস।) হাকিম কইলেক—তোমার নাম বটেশ্বর দাস? মুই কইলং, মাতালু ধনী। তিনেবার পুছিলেক হাকিম। তিনেবার কইলং দাস না হয়, ধনী। তার পাছে উকীল হ্যাটব ম্যাটর করিল। তো হাকিম পুছিলেক, তোমার পিতার নাম কি? কইলং—খুঁজি ন্যান তোমরা। তো সবে হাসির ধরলেক। মুই রাগ হয়্যা কইলং, যাক চোখে নাই ছ্যাখং তার নাম কেনে? লিখিব চান তো লিখি রাখেন—ডাঙ্গর ধনী। হাসি থামি গেইলেক। মুই রাগ হয়্যা কইলং লিখি রাখেন: যে জমিন ধরি-কাজিয়া সবে বাজার। দখলকার ডাঙ্গর-আই ডেমনি ধন্যা। তাঁয় ভাটিয়া গোঁসাইওক দান কবছে পাঁচ বিঘাও। হাকিম কইলেক; থামেন থামেন। কাগজে লিখছে ইগুলা গোঁসাই এর সম্পত্তি। মুই কইলং, কাগজে যা লিখছে তা লিখছে। উকীল ফির হ্যাটর ম্যাটর করিল—হোটিল, হোটিল। (কথাটা হোষ্টাইল।) হাকিম কয়, নামি যান। তো খাঁচা থাকি নামি আইসলং। তো হইল তোর যে সাক্ষী তো সে সাক্ষী।'

কাঁকরু বন্ধু মাতালুর হাকিমের সম্মুখে স্পষ্ট বাক্য বলার সৎসাহসে মুগ্ধ হ'য়েছিলো। সে বললো 'ঠিকে করছিস্।'

পাশাপাশি দু'জনে হাঁটতে স্বরু করলো। কাঁকরুর কোথায় একটা কাজ ছিলো, সে কথা ভুলে গেছে ইতিমধ্যে। শহরের মানুষের কাছে এই নগণ্য ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত উত্তেজক

একটা ঘটনার মতো অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু সে চিন্তার এক স্তরে গিয়ে মনে মনে হাসছিলো, সেটা প্রফুল্লতার ছাপ নিয়ে মুখে ফুটলো। প্রচলিত গানের একটা কলি আবৃত্তি করলো সে: হাহারে কুমকুরা সূতা হইলেক লোহার গুনা।

'কি ত্যা ?'

'ভাটিয়াব কন্যা তোকে বিপাকে ফেলাইছে বে মাতালু।'

'কায় মালতী ?'

'সম্ভব।'

দু'জনে আবার নীরবে পথ চললো।

রেশমের সুতোও ভাগ্যগুণে লোহার তারেব শক্ত বাঁধন হয়। গোঁসাইএর মেয়ে মালতীর বয়স এবাব আঠারোতে পৌঁছেছে। এমন কিছু সুন্দর নয় দেখতে, তবু যৌবন ও স্বাস্থ্য তাকে রেশমের মতোই আকর্ষণীয় ক'রে রেখেছে। দুখিয়ার কুঠিতে দু'ঘর ভাটিয়ার বাড়ি, দুটোই গোঁসাইদের। মালতী আদিবাসীদের ঘরদুয়োরের সঙ্গেও পরিচিত। তার শৈশবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে ডাঙ্গরআইএর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া ক'রে তারই ঘবে সে একবেলা ঘুমিয়ে থেকেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার গতিবিধিতে কিছুটা বাছ-বিচার দেখা দিয়েছে, তা হ'লেও কোন কোন বিকেলে সে এখনও ডাঙ্গর-আইএর ঘরে এসে বসে, পানের ডাবর টেনে নিয়ে এ দেশীয় পদ্ধতিতে মজাগুয়া দিয়ে পান খায়। ডাঙ্গরআইএর সঙ্গে এ দেশীয় ভাষায় গল্পগুজব করে। মাতালুর সঙ্গে সে ছোটবেলায় খেলেছে নিজেদের বাড়িতে এবং ডাঙ্গরআইএর বাড়িতে। ধানের জমির আল দিয়ে দু'জনে অনেক বেড়িয়েছে, পথে হারিয়ে ফেলেছে। এমন কি দু'এক বছর আগেও একদিন সে মাছ ধরতে নেমেছিলো গদাধরের জলে মাতালু কাঁকরুর দলে মিশে। তার ফলে অবশ্য বাড়িতে গালমন্দ শুনেছিলো সে।

মনের তলায় তলিয়ে দেখলে কথাটার মূলে রসিকতার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কি খুঁজে পাওয়া যায়? গ্রামের অন্য যে কোন যুবতীর তুলনায় মালতীকে মূল্যবান বলে মনে করে মাতালু। গ্রামের অন্য যুবকরা গোঁসাইদের সম্বন্ধে যতখানি সচেতন মাতালু যেন তার চাইতে বেশী উৎসুক তাদের ব্যাপারে। নতুবা এই মামলার বিষয়ে সে অনায়াসে মুই কি জানং ব'লে দূরে স'রে যেতে পারতো।

মামলা কাজিয়া নিশ্চয়ই ভালো জিনিষ নয় বিশেষ ক'রে আত্মীয়দের মধ্যে। মানুষ রাগ করে, চেঁচামিচি করে, রাগের মাথায় দু'এক ঘা এ ওকে বসিয়েও দেয়; কিন্তু সে রাগ ও উত্তেজনা ঠাণ্ডা কাগজে, ঠাণ্ডা কালি দিয়ে লিখে যারা জিইয়ে রাখতে পারে তারা ভয়ঙ্কর লোক; তাদের থেকে দূরে থাকাই ভালো লোকের উচিত। কাঁকরুর সঙ্গে কাঁকরুর দাদার খুব চটাচটি হ'য়েছিলো একবার। খবর পেয়ে গ্রামের অনেক পুরুষ ও নারী সেখানে গিয়েছিলো। সব শেষে ডাঙ্গরআই। সে গিয়ে প্রথমে কাঁকরুর দাদা চ্যারকেটুকে তীব্র স্বরে ধমক দিয়ে বললো—তুই মান্‌সি ন হয় রে চ্যারকেটু; ভাইওক মারছিস তুই, কাটি গেইছে। তুই মান্‌সি ন হয়। তারপরে কাঁকরুর দিকে ফিরে রাগে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললো সে—তুই মান্‌সি ন হয় রে কাঁকরু, তুই মান্‌সি ন হয়। পিতার তুল্য দাদাক রুখি গেইছিস! ঝগড়াটা তখনকার মতো থেমে গিয়েছিলো এবং অন্য অনেক ঝগড়ার মতো একেবারেই হয়তো নিভে যেতো। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাটিয়ার বুদ্ধি নিয়েছিলো চ্যারকেটু। একটা মামলা বাধবার সম্ভবনাও দেখা দিয়েছিলো। কিন্তু কাঁকরু প্রথমে, পরে চ্যারকেটু প্রতিনিবৃত্ত হলো। স্বজাতীয়রা কেউ তাদের উৎসাহ দিলো না, নিরুৎসাহও করলো না। বরং যেন অবাক হ'য়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলো যেন বা তারা ভিন্ন জগতের অধিবাসী। কিন্তু তারা পৃথকান্ন হলো যেন বা গোঁসাইদের অনুকরণ ক'রেই। এর

ফলে চ্যারকেটুর লোকসানই হয়েছে। কারণ আয়ের তুলনায় চ্যারকেটুর পুত্রকন্যার সংখ্যা বেশী। অনেকদিন পর্যন্ত সমাজেও তাদের অসুবিধা ছিলো। অবশেষে গ্রামের অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা রংবর ও তার ছেলে ফুলবর চেষ্টা ক'রে তাদের জাতে তুলেছে।

মাতালুর মনে এই কথাগুলোই উঠলো। এবং সে যেন খানিকটা মিইয়ে গেলো। মালতীর আকর্ষণেই কি সত্যি সে গৃহবিবাদের মতো অরুচিকর ব্যাপারে অংশ নিয়েছিলো? তার আকর্ষণে সে তো একটা ভালো কাজও করতে পারতো। কি ভাগ্য তার!

সে বললো, 'ইগুলা বয়া কাম, রে কাঁকরু।'

'কোন কাম?'

'ই মামলা-কাজিয়া'

'হবার পায়।'

'নিচ্চয় করি কও ইগুলা ভালো ন হয়, বয়া। ছাড়ি দে ইগুলা কথা।'

মাতালু মামলার মতো নোংরা বিষয়টিকে যেন মন থেকেও ঝেড়ে ফেলবে। এই অশান্তিতে জড়িয়ে প'ড়ে যেন ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত বোধ হচ্ছে দেহটাকে। সে বিষয়ান্তরে যাওয়ার জন্য খানিকটা যেন অনিচ্ছাতেই স্নানরতা জলপরীদের কথা উত্থাপন করলো।

'কাঁয়রে, কোটে?' কাঁকরু বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'শহরৎ। গদাধরর কোলে; বনবাড়ি থাকি বিরাইল কন্যা, ঠগমগ রূপ। অঙ্গৎ নাইরে বসন কন্যার, কেশ দিয়া ঝাঁপা গাও।'

'সত্যি কইস?'

'ন হয়রে, মনৎ হয় শহরের কোন বেটি-ছাওয়া হইবে।'

'তুই ফান্দৎ পড়ছিস রে মাতালু, রুদ্ধার (উদ্ধার) নাই।' কথাটা ব'লে কাঁকরু এবার সুর ক'রে প্রচলিত গানটা ধরলো:

'ফাল্দৎ পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা,

হাহারে কুম্‌কুরা সুতা হইলেক লোহার গুনা।"

মাতালু বললো; 'ভালো তোর গানা কিস্তুক তোক ধরি যাইম্‌। দেখাইম্‌ তোক জলপরী, নিচ্চয় করি কঙ্‌।'

কাঁকরুর বাড়ি যাবার পথটা এখান থেকে বাঁক নিয়েছে। মাতালুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার কাজ হয় নি, বাড়ি ফিরে যাওয়াই এখন সে প্রয়োজন বোধ করলো।

সে বললো, 'মাতালু, ফুল পাকড়ি ধানের বেছন আছে রে তোর ঝাড়া?'

'রাখছং ঝাড়িয়া। যাইস বেলা পড়ি গেইলে।

দূরে বড়ো গোঁসাইদের বাড়িটা ছোখে পড়ছে। চোটো তরফের নতুন বাড়িটা ওরই পিছন দিকে। মাতালুর সামনে কয়েক হাত দূরে একটা বুড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার কিছু দূরেই প্রকাণ্ড রক্তকরবীর গাছটা। বয়সে কৃষ্ণচূড়ার সমান হলেও যেন বাড়ন্তটা তারই বেশী। এরা নাকি কুঠির বাগানের শেষ চিহ্ন। এরই পিছনে মাতালুর বাড়ি।

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে মাতালু রংবরকে দেখতে পেলো। রংবর এ গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী, বয়স সত্তর পার হয়েছে। তার দেহের উচ্চতা ও মুখের গড়ন থেকে তাকে ভোটবংশীয় ব'লে মনে হয়। তার পরনে নেংটি, পায়ে সুপুরির খোলা ও দড়ি দিয়ে তৈরী চপ্পল। মাটির একটা হাঁড়ি কোলে ক'রে ব'সে সে মাতালুদের গাই দুইছে। রংবর পায়ের শব্দে চোখ তুলে মাতালুকে দেখে নিয়ে নিজের কাজের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, 'আইসলেন, বা?'

মাতালু রংবরের অনতিদূরে উবু হ'য়ে ব'সে পড়লো, 'আইসলং।'

'হইল কাম?'

মাতালু কথা বলার আগে খেদসূচক চু-চু শব্দ করলো, 'যা হইল তা হইল্‌। কিস্তুক, আজা, না যাও আর কোটে ফিন সওয়ালের

দিন।'

'হইল্ কি ?'

'কণ্ড্ পাছে। পয়লা তোমার থাকি শুনি নেঙ্ ভাটিয়া গোঁসাইও কথা।'

'যাও ত্যা, গাও ধোন, সাঁঝৎ কইম।'

মাতাগু উঠে গেলো কিন্তু হাত পা ধোয়ার বন্দোবস্ত না ক'রে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলো। ইতিমধ্যে সেও বাইরে যাবার পোশাক ছেড়ে ফেলেছে। তার পরনে এখন কাজের পোশাক অর্থাৎ বড়গোছের একটি নেংটি পরা। পাঁচ ছয়টি দুধেলা গরু দুইতে হবে। সে বংবরের হাত থেকে কেঁড়ে নিয়ে একটা গরুর কাছে গিয়ে বসলো।

'আজা।'

'কন্।'

'আজ দুখ্ পাইছ, আজা, গাইওক ঘাসপানি দিছ, বলদক ঘাসপানি দিছ, এলা দুধ দোয়ার ধরছ। মামু কোটে গেইছে ?'

'ক্ষেত বাড়ি।'

'ফিন দেখঙ, মামু একলা মানসি ক্ষেত গেইছে। আজী কি করছে ?'

'ধান-ঝাড়া হবার পায়।'

'ফিন্ দেখঙ আজী দুখ্ পাইছে। আজা,—বাপুরে'

'কি হইল ত্যা ?'

'মশা ধরছে। ত্যা আজা।

'কন্।'

'মুই কোটে গেইলং, আর তোমরা বুড়া-বুড়ী দুখ্ পাছেন।'

রংবর নীরবে শুনে যেতে লাগলো।

মনঃকষ্টের সময়ে মানুষকে কথা বলার সুযোগ দিতে হয় গরু

॥ তিন ॥

এখন থেকে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগে, শহরে নায়েব আহিলকার বসবার সমসাময়িক কালে গোঁসাই এ অঞ্চলে আসে। নায়েব আহিলকারকে ব'লে ক'য়ে তার কাছারির কাছে একটা ছোটো কুঁড়ে তুলবার অনুমতি নিয়ে সে শহরে বসবাস সুরু করে।

কোম্পানির রাজত্ব থেকে অনেক লোক এ রাজ্যে নানা কাজ নিয়ে অনুপ্রবেশ করছিলো এর কিছুদিন আগে থেকেই, বড়ো বড়ো রাজপুরুষ থেকে পেয়াদা-চাপরাসীর পদে পর্যন্ত তারা নিযুক্ত হচ্ছিলো। একজন পা রাখবার জায়গা পেলেই সে তার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে আনছিলো। কিংবা ছুটি-ছাটায় সে দেশে-গ্রামে গেলে তার মুখে এদেশের ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার কথা শুনে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় লোক এর দিকে প্রলুব্ধ হচ্ছিলো। হয়তো এর পিছনে কোম্পানি—সরকারের পরোক্ষ সমর্থন ছিলো যেমন তার প্রত্যক্ষ সমর্থন দরকার হ'তো রাজ্যের বড়ো বড়ো পদগুলিতে কাউকে নিয়োগ করার আগে।

এদেরই একজন হেরম্ব গোঁসাই। চাকরি যোগাড় ক'রে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ এই সময়ের এক বিধানে ন্যূনপক্ষে এণ্টান্স পরীক্ষায় পাশ না করলে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই আর ছিলো না। অগত্যা হেরম্ব গোঁসাই এই মহকুমা শহরে এসে বাঁধি কারবার ধরলো। কিন্তু মূলধন তার সামান্যই ছিলো। বিনা মূলধনের পৈত্রিক ব্যবসা অর্থাৎ

গুরুগিরি এবং পুরোহিতের কাজে তার রুচি ছিলো না। নিজের দেশে এই পেশাগুলি অবলম্বন করতে গিয়ে সে অনেক কষ্ট পেয়েছিলো। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেখানে রাষ্ট্র করেছিলো একবার এক পেশাগত কলহের ফলে: তার মা ব্রাহ্মণ কন্যা বটে কিন্তু পুরোপুরি নয়, তার মাতামহী ছিলো ভরার মেয়ে এবং ব্রাহ্মণের আশ্রিতা মাত্র, বিবাহিতা নয়। তার প্রতিবাদ করার সাহস ছিলো না, কারণ গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারই প্রতিপক্ষের আশ্রয়।

হেরম্ব গোঁসাই লক্ষ্য করেছিলো এ অঞ্চলের কৃষকরা শস্য উৎপাদন করার ব্যাপারে অপটু নয় কিন্তু উৎপন্ন শস্যের মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন। ব্যবসায়ের কোন বালাই নেই। পরিমাণ ও উৎকর্ষের দিক দিয়ে সারা বছরের শ্রেষ্ঠ ফসল হচ্ছে আমন ধান। ধান যে এত মিহি ও সুগন্ধি চাল দিতে পারে তা হেরম্ব এখানে আসবার আগে কল্পনাই করতে পারে নি। কিন্তু কি দুর্গতি সে ধানের! ধান গোলায় উঠবার কিছু-দিন পরেই রাজধানীতে হৈমন্তিক উৎসব হয় উপলক্ষ হিসাবে রাসপূর্ণিমাকে অবলম্বন ক'রে। সারা দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। গোরু গাড়ির বহর সাজিয়ে গ্রামকে গ্রাম রাজধানীতে চ'লে যায়। গোরু গাড়িগুলি শুধু যাত্রীদের বহন করে না, চাটাই-এর তৈরী বড়োবড়ো মটকি বোঝাই হ'য়ে ধানও যায় যাত্রীদের সঙ্গে। সেই ধানের বিনিময়ে তারা সারা বছরের প্রয়োজনের জিনিস শখের জিনিস সংগ্রহ করে। শহরের মহাজনরা জানে কোন গ্রাম থেকে কারা আসবে। বস্তুত পাণ্ডাদের মতো তারা গ্রাম ও পরিবার ঠিক ক'রে রাখতো বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুযোগ বুঝে তারা ধানের দাম কমাতো। উৎসব করাই যখন উদ্দেশ্য কে আর দরদস্তুর ক'রে মূল্যবান সময় নষ্ট করে? দাম পছন্দ হ'লো না ব'লে কে ধান পাহারা দিতে ব'সে থাকবে? ধানের বদলে টাকা পাওয়ার চাইতে জিনিস পাওয়াতেই আনন্দ।

প্রকৃতপক্ষে ধানের যে নিজস্ব একটা মূল্যমান আছে যা আপাতত প্রয়োজন বা শখের মূল্যের উপরে নির্ভর ক'রে চলে না, এটা যেন এরা জানতোই না। হেরম্ব ভেবে স্থির করেছিলো অত্যন্ত উর্বরা জমি, প্রচুর বর্ষা এবং জমির পরিমাণের তুলনায় জনসংখ্যার স্বল্পতাই এই চপল মতির কারণ। আর এ বিষয়ে সহায়তা করেছে মুদ্রার অভাব। হেরম্ব এ অঞ্চলে আসবার আগেই মুদ্রার প্রচলন কিছু কিছু হ'য়েছিলো। ঝুটি-বাঁধা রাণীর ছবি আঁকা টাকার মূল্যকে এরা বিশ্বাস করতে শিখেছে তার কারণ তহসিলদারও সে টাকাকে মূল্য দেয়। কিন্তু যে সামান্য কিছু মুদ্রা এদের হাতে আসে তহসিলদারকে দেবার জন্যই তা সঞ্চয় করে রাখে মাটির ভাঁড়ে মাটিতে পুঁতে। অন্য সব কাজ চলে বিনিময়-প্রথায়, এমন কি জমির দাম পর্যন্ত এরা দেয় ধান দিয়ে, বর্তমানের গোলা কিংবা ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চিত প্রত্যাশা থেকে।

হেরম্বই এ অঞ্চলে মুদ্রার প্রচলন করে। অন্তত দুখিয়ার কুঠিতে সে এ বিষয়ে একটা বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বিনিময় প্রথা এই বিশ বছরেই প্রায় অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছে। এখন শুধু শ্রমের বিনিময় চলে চাষীদের মধ্যে।

হেরম্বকে প্রথম দিকে বেগ পেতে হ'য়েছিলো। লোকে প্রথমেই তাকে বিশ্বাস করে নি। রাসের মেলায় না গিয়ে তার কাছে ধান বিক্রি করবে কি না, এ নিয়ে দ্বিধা করেছিলো কৃষকরা। কিন্তু মুদ্রার সুবিধা তারা এক রাসের মেলাতেই বুঝতে পারলো। ডাঙ্গর আইকে সাক্ষী রেখে এই স্থির হ'লো: শহরে বর্তমানে যে দামে ধান কিনছে মহাজনরা হেরম্ব মণ করা তার চাইতে দু'আনা কম দেবে। সেটুকুই তার লাভ। গাড়ির ভাড়া, গাড়োয়ানের ভাড়া ইত্যাদি হিসাব করলে মণ করা দু'আনার কম পড়ে না। আর যদি শহরের মহাজনদের গড়-পড়তা দাম এবং তার দামে দু'আনার বেশী পার্থক্য থাকে তবে সে ক্ষতি সে পূরণ করবে। সেবার ধানের বোঝা না-বইবার সুবিধা সকলেই

অনুভব করেছিলো মেলায় গিয়ে, উৎসবটা অনেক বেশী আনন্দ-জনক হয়েছিলো। এখন ডুখিয়ার কুঠি এবং আশপাশের গ্রামে পাঁচ দশ টাকার নোটও কিছু কিছু চলছে।

হেরম্বর ব্যবসাকে অবলম্বন ক'রে সভ্যতার নিদর্শনী একটা প্রথা ডুখিয়ার কুঠিতে এই ভাবে এসেছিলো।

নিঃস্ব হেরম্ব কালে এ অঞ্চলে মহাজন হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গদাধরপুরে এবং ডুখিয়ার কুঠিতে বাড়িঘর আড়ত-গোলাবাড়ি তুলে যেন চিরকালের জন্যই সাজিয়ে নিয়েছিলো সংসার। দেশে চিঠি লিখে নিজের সংসারের সকলকে আনিয়ে নিয়েছিলো। তার মধ্যে তার সৎ ভাই গজানন এবং তার স্ত্রী ছিলো।

কিন্তু ষাট বছর পূর্ণ হ'তে না হ'তে তাকে ইহলোক ত্যাগ করতে হ'লো। এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে এ খবর সে যেন নিজেই পেয়েছিলো যদিও সম্পূর্ণভাবে তা বিশ্বাস করে নি। মহাজনীতে প্রতিষ্ঠিত হবার মোহে তার নাওয়া খাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না। এবং পাকস্থলীর নানা রকমের ব্যাধিই আক্রমণ করেছিলো তাকে। ডাঙ্গর-আই এবং রংবর জানে এমন একটা ঘটনার কথা। ডুখিয়ার কুঠিতে তখনও হেরম্ব স্বল্প-পরিচিত। একদিন রংবর এসে বলেছিলোঃ

'আই, ভাটিয়ার ছাওয়া মরি যেইছে, আঃ-হা।'

'কেনে তা?'

'না জানঙ। গছর নিচে পড়ি আছে।'

ডাঙ্গর আই রংবরের সঙ্গে গিয়েছিলো দেখতে। গাছের তলায় হেরম্ব জ্ঞানহীন অবস্থায় প'ড়ে আছে। ফুলবর ও রংবর ধরাধরি ক'রে তাকে ডাঙ্গর আই-এর ঘরে এনে শুইয়ে দিয়েছিলো। তিন দিন ধ'রে দুঃসহ পেটের ব্যথায় ছটফট করলো সে। তখনি সে বিড়-বিড় ক'রে বলেছিলো,—মরব, এতেই একদিন পথের ধারে ম'রে প'ড়ে থাকব।

কিছুদিন পরে হ'লেও তার এ আশঙ্কাই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিলো। অবশ্য মৃত্যুটা ঠিক পথের ধারে হয় নি। অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিজের দেহকে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত ক'রেই সে অর্থ সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করেছিলো।

এ বিষয়ে তার ভাই গজাননের সঙ্গে তার পার্থক্য ছিলো। তার রোগাটে পাকানো চেহারার পাশে, গজাননের পুষ্ট আহারতৃপ্ত চেহারা দেখলেই যেন তাদের পার্থক্য ধরা পড়তো। ব্যবসায়ের বিষয়েও তেমনি তাদের প্রভেদ ছিলো। হেরম্ব বাঁধি কারবার করতো, দু'আনা লাভ রাখতে পারলে ভাবতো যথেষ্ট হ'লো। রাজধানীতে ধানের দাম চড়া হ'লে এদিকে ধান কিনবার সময়ে নিজেই দাম চড়িয়ে দিতো। অর্থনীতিবিদ্‌রা বলতে পারে—এটা তার উদারতার চিহ্ন নয়, আত্মরক্ষার চেষ্টা। সে এরকম না করলে, কৃষকদের কেউ-না-কেউ রাজধানীতে যাওয়া আসার সময়ে ধানের দাম জেনে এসে একটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পারতো। কিন্তু যেহেতু সে নিজে থেকেই কিছু কিছু দাম বাড়িয়ে দিতো তার, উপরে কৃষকদের বিশ্বাস কখনও নষ্ট হয় নি, ব্যবসায়েও বিঘ্ন দেখা দেয় নি। গজানন এসেই দেখেছিলো তাদের পরিবার কৃষকদের তুলনায় ধনী। হেরম্ব প্রথমদিকে অন্ততঃ কৃষকদের তুলনায় নিজেকে নিঃস্ব দেখেছিলো। গজানন তার দাদার বিপ্লবকে কাজে লাগালো। বিনিময়-প্রথায় ধীর মন্থর গতি থাকে ধনের। মুদ্রা-প্রথায় গতিটা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। আগে যে কৃষকরা শহরে ধান নিয়ে গিয়ে বিনিময়ে প্রয়োজনের জিনিস সংগ্রহ করতো তারা সহজে গাড়িতে ধান বোঝাই করার পরিশ্রম স্বীকার করতে আর চাইতো না। কিন্তু মুদ্রা নিয়ে খালি হাত-পায়ে শহরে যাওয়া অন্য-ব্যাপার। এর ফলে তাদের রাজধানীতে যাওয়া বেড়ে গিয়েছিলো; দশটা চিত্তহারী জিনিস দেখলে তার কিছু নিজস্ব করতে ইচ্ছা যায়, তার ফলে কৃষকদের খরচের হাতটাও বেড়ে গেলো। রাস-মেলার

উপলক্ষ ছাড়াও তারা খাজনার জন্য জমিয়ে রাখা টাকা পর্যন্ত খরচ ক'রে ফেলতো। সেই সুযোগে গজানন তেজারতি কারবার সুরু করলো। এবং এদের দুখ-ধন অর্থাৎ বন্দকী সম্পত্তি প্রভৃতি গ্রাস ক'রে অতিক্রুত আর্থিক আভিজাত্যের দিকে অগ্রসর হ'লো।

এই পার্থক্যের ফলে দুই গোঁসাই-ই কৃষকদের কাছে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরিচিত হলো। অনেক ব্যাপাব আছে যা বড়ো গোঁসাইকে বলা যায় ছোটো গোঁসাই-এর কাছে গোপন করতে হয়; অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটা গোসাই-এর বুদ্ধি নেয়াই ভালো। এ অঞ্চলের কৃষকদের পক্ষে এটাকেই চিন্তার জটিলতার সূত্রপাত বললে অত্যুক্তি হয় বটে, প্রবণতাটাকেও বর্ণনা করা হয়।

হেরম্বর মৃত্যুব কিছু আগেই তৎকালীন বিত্ত-সম্পত্তি দুই ভাই সমান ভাগে ভাগ ক'বে নিয়েছিলো। শুধু দুখিয়ার কুঠির বাড়ি এবং তৎসলগ্ন সাত আটবিঘা জমি এজমালি ছিলো। গজানন অধিকাংশ সময় গদাধরপুরে বাস করতো আর হেরম্ব দুখিয়ার কুঠিতে। কাজেই এজমালি জমি ও বাড়ি ভাগ ক'রে নেয়ার প্রশ্ন ওঠে নি। হেরম্বর মৃত্যুর কিছুদিন পরে গজাননের ইচ্ছা হলো বাঁশের চাঁচারির দেয়ালের পরিবর্তে তার ব্যবহারের ঘরগুলোতে সে ইটের দেয়াল দেবে। গজাননের স্ত্রী স্বামীর বুদ্ধিহীনতা দেখে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলো: এজমালি বাড়িতে পাকা ঘর তোলা আর পরের বাড়িতে পাকা ঘর তোলা সমান নির্বুদ্ধিতা। এই এজমালি ভাগ করা নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত হলো। তর্কবিতর্ক থেকে কোর্ট পর্যন্ত।

কিন্তু মাতালুর নির্বুদ্ধিতা আজ উকীলদের কোনঠাসা ক'রে দিয়েছে। সে হলফ প'ড়ে যে সাক্ষী দিয়েছে তারপরে অগ্রসর হ'তে উকীলরা আর সাহস পেলো না। মাতালুর সাক্ষ্য থেকে এই প্রমাণ হয় যে, জমিটাই আসলে গোঁসাইদের নয়। কতকটা

চাকরান জমির মতো জীবনকাল ভোগদখলে রাখার জন্য সাময়িক একটা ব্যবস্থা। সুতরাং দু'পক্ষের উকীল নায়েব আহিলকারের কাছে সোলে'র জন্য দরখাস্ত করেছে। আপসে নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে এবার। দু'পক্ষই বিব্রত বোধ করছে ; গজানন একটু বেশী। গদাধরপুরের গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তি সে। সে দুখিয়ার কুঠির একজন আদিবাসীর জমি ভোগ করছে চাকরান সর্তে এ ভাবতেও তার মন সংকীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তার আভিজাত্য-বোধ আঘাত পাচ্ছে। অবশ্য হেরম্ব জীবিত থাকলে কি হ'তো তা বলা যায় না। সে জানতো তার আদি ইতিহাস দুখিয়ার কুঠির সবাই জানে। তার অর্থ আছে কিন্তু জাঁক করার কিছু নেই। সে জাঁকের ফাঁকি আদিবাসীদের অজানা নয়।

ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে মাতালু যা বলেছে তারই মতো। রুগ্ন অসহায় অবস্থায় দিন তিনেক ডাঙ্গর আই-এর বাড়িতে কাটিয়ে হেরম্ব পরিচিত হয়েছিলো ডাঙ্গর আই-এর সঙ্গে। উপকারের প্রতিদান স্বরূপ ধান বিক্রির সময় হ'লে হেরম্ব তাকে পরামর্শ দিতো। ডাঙ্গর আই লক্ষ্য করেছিলো হেরম্বর পরামর্শ নিয়ে সে লাভবানই হচ্ছে। একদিন ডাঙ্গর আই হেরম্বকে বলেছিলো, দুখিয়ার কুঠিতেই যখন বারবার তাকে আসতে হয় তখন রোদে-জলে ঘোরাঘুরি ক'রে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি নেয়ার বদলে দুখিয়ার কুঠিতে বাসা করাইতো ভালো। ঘর তুলবার জায়গা দিয়েছিলো ডাঙ্গর আই। দ্বিতীয়বার সেটেলমেণ্টের সময়ে হেরম্ব কিছু ফেরফার করেছিলো। কিন্তু সে হাঙ্গামা মিটে গেলে ডাঙ্গর আই দেখতে পেয়েছিলো হেরম্ব তার পক্ষ হ'য়ে তদ্বির তদারক ক'রে ভালোই করেছে। অন্য অনেকের জমির পরিমাণ ক'মে গেলেও তার জমি কোথাও কমে নি। এদিকের কৃষকরা আত্মবিস্তারের তাগিদে রাজার সংরক্ষিত বন থেকে ক্রমাগত চাষের জমি কেড়ে নিচ্ছিলো।

সেটেলমেণ্ট বনের ধারের অনেক জমিই আবার বনের সীমায় ঢুকিয়ে নিয়েছে, ডাঙ্গর আই-এর বেলায় তা হয়নি। কিন্তু ডাঙ্গর আই এও লক্ষ্য করেছিলো হেরম্বর দখলী জমি বেড়েছে। সে নিজে তাকে বসবাস করার জন্য যে বিঘা চারেক জমি দিয়েছিলো সেটা গদাধরের পুরনো খাতের দিকে বেড়ে গিয়ে রাজার খাসের জমি গ্রাস করেছে—পরিমাণে দাঁড়িয়েছে প্রায় আটদশ বিঘা। শুনে ডাঙ্গর আই বলেছিলো প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে, ভাটিয়ার বুদ্ধি তো ভালই দেখঙ্। জমি-জমার ব্যাপারে বুদ্ধি দেয়াই শুধু নয়, মাতালুর জন্মদিনে ডাঙ্গর আই-এর বাড়িতে বিশেষ ঘটা ক'রে গদাধর নারায়ণের পুজো হয়। সে পুজোর প্রচলন করেছিলো হেরম্ব এবং লাভজনক পৌরোহিত্যটাও সেই করতো। হেরম্বর সঙ্গে ডাঙ্গর আই-এর সদ্ভাবই ছিলো। একধরনের শ্রদ্ধাও করতো হেরম্ব তাকে।

মাতালু যখন গোঁসাইদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছালো তখন হেরম্বর ছেলেরা আপসের কথা নিয়েই আলোচনা করছে। তার সঙ্গে আজ কেউই কথা বললো না।

সেখান থেকে স'রে গিয়ে মাতালু মালতীর খোঁজ করলো। মালতী ভিতর দিকের একটা ঘরে ব'সে সুপারি কাটছিলো। মাতালু অন্দরের কোন ঘরে ঢোকে না অজকাল না ডাকলে। বয়স হয়েছে তার। সে ঘুরে গিয়ে ঘরটার একটা জানালার বাইরে দাঁড়ালো।

'মালতী।'

মালতী চমকে উঠে মুখ তুলে চাইলো। মালতীর মনে বিরাগ বা বিরক্তি কোনটাই প্রবল হ'য়ে ওঠেনি কিন্তু সে দুপুর থেকে বিকেল এবং এখন প্রায় সন্ধ্যা হ'তে চললো ভাইদের আলাপে মাতালুর প্রতি এত ধিক্কার শুনেছে যে আবাল্য সঙ্গী এই লোকটির সঙ্গে সহজভাবে কথা বলাটা উচিত হবে কিনা ভেবে পেলো না।

'মালতী।'

'কি?'

'তোমরা শুনছ মামলার কথা।'

'শুনছি, আপস হবে।'

খবরটা মাতালুর কাছে নতুন। সে বলল, 'ইস কও কি? আপস? ভালো খবব তা।'

মালতী সুপারি কাটায় মন দিলো আবার।

কথা খুঁজে না-পেয়ে মাতালু বললো, 'সুপারি-গুয়া দিবে না?'

সামনের রেকাবি থেকে এক মুঠো সুপাবি নিয়ে জানালা গলিয়ে মাতলুর হাতে দিলো মালতী।

'আপস হইল কেনে?'

'হবে না, তুমি যে বোম্ বুদ্ধু।'

'বুদ্ধু!' কথাটা না-জানার ফলে মাতালু বিস্ময় প্রকাশ করলো।

'হঁ্যা। অকাট-মুখ্খু।'

'কেনে?'

নিজের পিতা সম্বন্ধে যে খবর এজলাসে দাঁড়িয়ে ব'লে এসেছে মাতালু সে কথা স্বাভাবিক সঙ্কোচেই মালতী মুখে আনতে পাবলো না। তার দাদাবা ধিক্কার দিয়ে বলেছিলো, বেটা যেন কর্ণ। কিন্তু কলঙ্কের অসাধারণত্বে মানুষের যে স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে তারই ফলে যেন সে চোরা চোখে মাতালুর মুখখানা আর একবার দেখে নিলো।

লোকে তাকে বোকা বলুক আর না-বলুক তাতে তার বুদ্ধির কম বেশী হবে না। বোকামি যদি সে ক'রেই থাকে তা অন্য সময়ে ভেবে দেখবে। এখন যেন অন্য কোন সময়। কিন্তু সে সময়ের উপযুক্ত কোন কথা মাতালু খুঁজে পেলো না; যদিও তার অনুভবে ধরা পড়েছিলো মালতীর চোখের কাজল।

'কাজল দিছ দেখঙ্।'

'কাজল!'

কাজল মালতী অনেকদিনই পরে, কিন্তু এই প্রথমে কেউ উল্লেখ করলো তার চোখের কাজলের কথা। যেন তা উল্লেখযোগ্য হ'তে পারে। চোখ দুটিকে মালতী সামনের রেকাবির দিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নামিয়ে রাখলো এক মুহূর্তের জন্য, তারপর তাকালো মাতালুর দিকে। সে দৃষ্টি যেন আগের চাইতে ডাগর, যেন মেলেধরা।

'মালতী।'

'কি?'

'কাল একবার যাইবে হামার বাড়ি।'

'কেন?'

'যাইবে?'

'কেন বলো না।'

'যাইবে তো?'

'আচ্ছা সে তখন দেখব।'

মাতালু গোঁসাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বাড়ির পথ ধরলো। কাল যদি আসে মালতী কি বলবে তাকে সে? এ-রকম ভাবে আগে কোনদিনই সে নিমন্ত্রণ করে নি। কাজেই নিমন্ত্রণের একটা উপলক্ষ খুঁজে বার করা দরকার। আর সে যদি আসেই তবে এই অনন্যসাধারণ ব্যাপারটার মূল্য দেয়ার জন্যই বোধ হয় কিছু উপহার তাকে দেয়া উচিত।

তারপরে মালতীর চোখ দুটি মনে পড়লো তার। মালতীর দেহের ছাঁদ তার বাবার মতো, অর্থাৎ রোগাটে এবং লম্বা, রংটা চাপা। নিরপেক্ষভাবে দেখলে এই উনিশ বছরের মেয়েটিকে আকর্ষণীয় মনে হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু মাতালু এ কথা হলফ প'ড়ে বলতে পারে

এমন দুটি চঞ্চল চোখ দেখা যায় না অন্য কোথাও।

বাড়িতে ঢুকে সে দেখলো রংবর গরু বলদগুলোকে গোয়ালে তুলছে।

মাতালু বললো আজা রে, ব্যস্ মামলা,' 'মিটি গেইছে, ব্যস্।'

'হয় নাকি। ভালে দেখঙ।'

অন্যের শান্তির সংবাদে আনন্দিত হ'লো রংবর।

॥ চার ॥

মালতী আসবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ ছিলো মাতালুর। তবু অনেক চিন্তা ক'রে সে অবশেষে স্থির করেছিলো উপহার দেয়ার বিষয়ে সে রংবরের স্ত্রী ফুলমতার সাহায্যই নেবে। ভালো এণ্ডি বোনে ফুলমতী। শহর থেকে আসবার সময়ে যে চাদরটা মাতালুর মাথায় জড়ানো ছিলো তাও তারই হাতের বোনা। দু'তিন মাস যাবৎ ডাঙ্গর আই-এর ব্যবহারের জন্য সে একটা চাদর বুনছে। এতদিনে সেটা শেষ হ'য়ে যাবার কথা। ফুলমতার কাছে প্রস্তাব করতে হবে। এবং হয়তো সে রাজীও হবে। ডাঙ্গর আই-এর চাদরের অভাব নেই, আর তা ছাড়া সে আজকাল রাজধানী থেকে ধোয়া মলমলের চাদর আনিয়েই ব্যবহার করে। এখানে ব'লে রাখা যায় এদেশের মেয়েদের চাদর তাদের বক্ষবাসের কাজ করে।

প্রস্তাব করতেই ফুলমতী রাজী হয়েছে। তার চোখে অবশ্য ভাটিয়ার কন্যা মালতী আকাঙ্ক্ষার যোগ্যা নারী নয়, কিন্তু দৌহিত্র স্থানীয় মাতালুর বক্তব্য শুনে সে কৌতূহলের কারণ খুঁজে পেলো। চাদরটাকে ইস্ত্রি করা বাকি ছিলো। কাঠের কুঁদায় জড়িয়ে কাঠের চাপে ইস্ত্রি করতে হয়, নতুবা মসৃণ হয় না জমি। কিন্তু মাতালুর হাতে তত সময় নেই।

কিন্তু মালতী কি আসবে? যে নিজে থেকেই কখন কখন আসে নিমন্ত্রণ পেলে তার পক্ষে আসাটা সহজ হওয়া উচিত, কিন্তু মাতালু নিজেই যেন একটা কুণ্ঠা বোধ করছে, একটা অনির্দিষ্ট গোপন-প্রয়াস

তার মনে দেখা দিচ্ছে কখন কখন, যেমনটা আগে কখন হয় নি।

সময় পার ক'রে মালতী এলো। দু'তিন মাস পরে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। একটু যেন তাড়াতাড়ি হেঁটে এসেছে সে। হাঁপাচ্ছে, ঠোঁট দুটি যেন কিছু উন্মুক্ত।

'মাতালু।'

কি হ'লো মাতালুর, সে কিছুতেই চোখ তুলে চাইতে পারলো না মালতীর দিকে।

'মাতালু।'

মাতালু মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো কথার জন্য।

মালতী বললো, 'মাতালু, একটা কাজ করবে আমার ?'

'কও।'

'ছোড়দা কেএকটু খবর দেবে ?'

'তা দিম্।'

'যেখানে রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে সেখানে ছোড়দার বন্ধু আছে একজন। সেখানেই পাবে তাকে। বলবে এখুনি একবার বাড়িতে আসা দরকার। যাবে ?'

'তা যাও। শোনো, তোমাক্ একটা জিনিস আনি দেও, তার পাছে।'

'তুমি দিও ফিরে এসে। লক্ষ্মী মাতালু।'

মাতালু চ'লে গেলো, মালতীও ফিরে গেলো।

মালতীদের বাড়িতে আবার একটা অশান্তির সৃষ্টি হ'য়েছে। মালতীর মেজদাদা রাজধানীতে থেকে কলেজে পড়ে। এইবার দিয়ে তিনবার হ'লো তার আই-এ পরীক্ষা দেয়া। তার অকৃতকার্যতার নানা কারণই থাকতে পারে। সে এখন আই-এ পরীক্ষা আর না-দিয়ে সাব-ওভারসিয়ার হওয়ার চেষ্টা করতে চায়।

এতে মালতীর বড়দাদা আপত্তি করেছে।

বড়দাদা বলেছিলো : এতগুনো টাকা খরচ করলি আই-এ.'র পিছনে। আর একবার চেষ্টা কর। তারপরে যা হয় করিস। এই নিয়েই সূত্রপাত।

রাগের মাথায় বড়দাদা বলেছে, 'টাকা নষ্ট করিস খালি-খালি, তোকে দিয়ে আর বিশ্বাস নেই। আজকাল ক্রমশই বেশী টাকা লাগছে তোর। আমি আর টাকা দিতে পারব না।'

মেজদাদা চিৎকার ক'রে উঠেছিলো, 'টাকাটার সব তোমার নয়। আমার টাকা দিয়ে আমি যা খুশি করব।'

মা এসে দাঁড়াতেই মেজদাদা বলেছিলো, 'কার জন্যে টাকা খরচ হয় শুনি? আমার কি ছেলে-বউ আছে।'

তার ইঙ্গিত ছিলো, বড়দাদার ছেলে-বউ আছে, তার জন্য যে টাকা খরচ হয় অবিবাহিত ভাইদের জন্য তা হয় না।

মা বড়দাদাকে অনুরোধ করেছিলো, 'তুই এখনকার মতো দিয়ে দে টাকাটা।'

বড়দাদা বলেছিলো, 'বেশ ত' দিচ্ছি। কিন্তু এরপরে মালতীর বিয়ের টাকা যদি খরচ হ'য়ে যায়, আমাকে কিছু ব'লো না।'

এ-কথাটাই মালতীকে ঘর থেকে ঠেলে বার করেছে। তার মনে হ'য়েছিলো সেই এই ঝগড়ার কারণ।

বড়দাদার কাজকর্ম এমন কি কথাবার্তাও মালতীর বাবার মতো। লেখাপড়া তার পাঠশালা পর্যন্ত। দেশে থাকতেই যা হয়েছে। এখানে আসবার পর বাড়িতে ব'সে হাতের লেখা মক্শ করেছে ব্যবসার খাতা লিখে। সংসারের জন্য, ব্যবসা চালানোর জন্য পরিশ্রম যা কিছু সেই করে। মালতীর চোখে সেই এই পরিবারটার আশ্রয়স্থল।

মেজদাদাকেও মালতী ভালবাসে। ছোটবেলা থেকেই রাজধানীর স্কুলে সে পড়ছে। পরিবারের মধ্যে বেশভূষার দিক দিয়ে যেমন,

কথাবার্তা, রুচির দিক দিয়েও তেমনি সেই সব চাইতে মার্জিত, যদিও সে আজ অত্যন্ত রাগ ক'রে অনেক রূঢ় কথা বলেছে। সে হেঁটে গেলে প্রসাধনের মৃদু গন্ধ পাওয়া যায়। ভাইবোনদের জন্য সেও চিন্তা করে নিজের পথে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মালতী বা তার ছোড়দার ব্যবহারের সব কিছু শৌখিন জিনিষ সেই কিনে এনেছে এতদিন।

মালতীর বাবা বেঁচে থাকতে একটা আলোচনার বিষয় হয়েছিলো মেজদার এই রীতি।

'ওটা কি হবে?' মালতীর বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

ছোড়দাদার জন্য একটা হাত ঘড়ি কিনে এনেছিলো মেজদাদা, তাই এই প্রশ্ন।

'ভদ্র লোকের ছেলেরা ঘড়ি পরবেই তো।' বলেছিলো মেজদাদা।

সূর্য থেকে সময় চিনতে অভ্যস্ত বৈষ্ণবের কাছে হাতঘড়ি একটা নিরর্থক খেলনা ছিলো। কিন্তু নিজের অভ্যস্ত জীবনধারার সঙ্গে ছেলেদের জীবনের পার্থক্য বোঝাতে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ' এই কথাটা ব'লেই সে চুপ ক'রে গিয়েছিলো। কারণ সে অনুভব করছিলো তার জীবন যেখান থেকে সুরু হয়েছিলো ছেলেদের জীবন তার কয়েক ধাপ উপরের থেকে সুরু হবে। সে অর্থসঞ্চয় করেছে অসীম ক্লেশ স্বীকার করে। ছেলেরা একটু আরামপ্রিয় হবেই। গজাননও তার মতো সাদামাটা নীরস জীবন যাপন করে না। ভেবে দেখতে গেলে গজাননের জীবনও তার তুলনায় আভিজাত্যের এক ধাপ উপরে সুরু হয়েছে।

এ অবস্থায় ছোড়দা এসে কি করবে মালতী জানে না, কিন্তু যদি বিসম্বাদ গুরুতর হ'য়ে ওঠে, অন্তত দু'জনের মাঝখানে গিয়ে তো দাঁড়াতে পারবে।

মাতালু রওনা হ'য়ে গেলে মালতী ভাবলো; তাকে বোকা ব'লে

ভালো হয় নি। আপদে বিপদে যে লোকটা অনুযোগ না তুলে এগিয়ে আসে সে বোকা হ'লেও তার মুখের উপরে সেটা বলা ভালো দেখায় না।

মাতালু হন্ হন্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছিলো। সে ভাবলো : সে ফিরে আসা পর্যন্ত কি মালতী অপেক্ষা ক'রে থাকবে? লক্ষ্য করো আজও সে কাজল পরেছে। বেশ চোখ দুটি মালতীর। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। কিন্তু কি হ'লো ওদের বাড়িতে কে জানে। বুড়ো গোঁসাই-এর মৃত্যুর পর থেকে একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে।

হঠাৎ কেন নজর পড়লো এদিকে তা বোধ হয় হুকুমের মালিক ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। রাজধানী থেকে এই সড়কটা দেখদেখ ক'রে এগিয়ে আসছে গদাধরপুরের দিকে। যে রকম গতিতে আসছে তাতে মনে হয় সে গদাধরপুর ছাড়িয়েও এগিয়ে যাবে। যখন সেটলমেণ্ট হয়েছিলো এবং আমিনরা আসতে আরম্ভ করে তখনকার কথা মাতালু গল্পে শুনেছে। তখনও নাকি এমনি সোরগোল পড়েছিলো এ অঞ্চলে। অফিসের তাঁবু পড়তো যে গ্রামে তার থেকে দু-পাঁচ মাইল এগিয়েও সব গ্রামে একটা অস্বস্তি যেন আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতো। হয়তো সড়ক যে সব গ্রামের কাছে এসেছে সেখানেও তেমনি একটা অস্বাচ্ছন্দ্য ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেটলমেণ্টের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারে নি তখন। এখন দেখা যাচ্ছে ইচ্ছামত বন-অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নিয়ে চাষ আবাদ করা বন্ধ হয়েছে। লোকসংখ্যার চাপ গ্রামের জমিব উপরে যতই পড়ুক, ধারে কাছে জঙ্গল হ'য়ে-যাওয়া জমির দিকে হাত বাড়ালে চলবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে মাতালুর নালিশ নেই। যাদের হুকুমে এ সব কাজ হয় কখন কখন তাদের কাজকর্মে সন্দেহ এলেও সে বরং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করেছে, তারা সব জায়গার খবর এক সঙ্গে পায়, সব

দিকে নজর রেখে মনঃস্থির করে, সুতরাং একেবারে অবিশ্বাস করা যায় না তাদের সদ্‌বুদ্ধিকে। তার এ সিদ্ধান্তের মূলে হয়তো 'গোঁসাই বাড়ির কারো আলোচনা আছে। অবশ্য কথাটা ঠিক কে বলেছিলো তা তার মনে নেই।

সন্ধ্যার রং লেগেছে তখন আকাশে, কিন্তু কাছের জিনিস তখনও স্পষ্ট দেখা যায়। মাতালু্ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলো কারা যেন মাটি দিয়ে মস্ত একটা স্তূ্প ক'রে রেখেছে। সে যে পথ ধ'রে এসেছিলো সেটা বহু পুরনো পথ। স্তূ্পটা যেন তার বাঁয়ের দিকে, রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। ওদিকে আবাদের জমি থাকবারই কথা। সেই জমির উপরে মাটি রাখলো কে? এখন হেঁউতির ফলনের সময়। এ অঞ্চলের কৃষকদের ধন-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম সবই এই হেঁউতির ফলনের উপর নির্ভর করে। ও জমিটাও সবুজ ধানের ছড়ায় পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকার কথা। মাতালু্ ভাবলো যদি কৃষক নিজেই জমিতে মাটি তুলে থাকে এখন, তবে সে নিশ্চয়ই হঠাৎ কোন কারণে ঘোর উন্মাদ হ'য়ে পড়েছে; আর অন্য কেউ যদি এ কাজ করে থাকে, তবে সে মানুষ নয়, মানুষের পক্ষে এতটা নির্দয় হওয়া সম্ভব নয়।

মাতালু্ এই সব ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ তাকে থামতে হ'লো। তার পথ রোধ ক'রে এখানেও একটা মাটির স্তূ্প। স্তূ্প নয়, প্রাকার। ডাইনে বাঁয়ে সেই ম্লান আলোয় যতদূর দৃষ্টি চলে আলগা মাটির মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর তার পথকে কেটে চ'লে গেছে। অবাক কাণ্ড! কিন্তু থামলে চলবে না তার, খবরটা পৌঁছে দেয়া দরকার মালতীর ছোড়দাকে। সে প্রাচীরটার কোল ঘেঁষে এগোনোর চেষ্টা ক'রে থামলো। পায়ের তলায় কাঁচা ধানের ছড়া লাগছে। গাছগুলির গোড়া পড়েছে প্রাচীরের তলে, শিষ সমেত মাথাটা লুটিয়ে আছে মাটিতে। হঠাৎ স্ফুরিত হ'লো

তার মনে, তাহ'লে এই প্রাকারটাই নতুন সড়ক। হাত পায়ের সাহায্যে সে আলগা মাটির প্রাচীরটার মাথাতে উঠে পড়লো।

যা তার হঠাৎ মনে হ'য়েছে ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে তাই। নতুন সড়ক পুরনো পথ ধ'রে চলছে না। এ দু'টির চালই যেন আলাদা। পুরনো পথ চলতো এঁকে বেঁকে, দু'পাশের জমিকে বাঁচিয়ে। জমির শস্য-বহন যে করবে, সে কর্তব্য পালন করাই যার পরম গৌরব, সে জমিকে খাতির না-ক'রে পারে না। কিন্তু নতুন সড়ক সোজা ধেয়ে চলেছে। তার গতি দেখে তার মতি বোঝা যায় না। মনে হয় আর যে উদ্দেশ্যই তার থাক, সেটা জমি এবং ফসলকে খাতির করা নয়।

বাঁয়ের দিকে সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চাইলে সে নতুন সড়কটার অগ্রগতি সম্বন্ধে জল্পনা করতে পারতো। দুখিয়ার কুঠি দিয়ে যাওয়ার সময়ে কার-কার জমির উপর দিয়ে এই কালো-নদী প্রবাহিত হবে তাও আন্দাজ করতে পারতো। কিন্তু একবারে নিজের পায়ের তলায় মাড়িয়ে আসা ধানের গোছার চাইতে দূর ভবিষ্যতের দিকে তার মন অগ্রসর হ'তে চাইলো না। বরং ডাইনেব দিকে জোনাকির মতো জ্বলা আলোর দিকেই তার দৃষ্টি ও মন ধাবিত হ'লো। ওই দিকেই তাহ'লে রাস্তার মজুর এবং তাদের মালিকরা আছে। এবং এইখানেই মালতীর ছোড়দাকে পাওয়া যাবে।

কাঁচা মাটি, বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো, নরম নরম সদ্যঢালা পিচের উপর দিয়ে চ'লে চ'লে অবশেষে নতুন পথের বালিঢাকা মসৃণ সমতায় পৌঁছে গেলো মাতাল্লু। দু'পাশে এতক্ষণ যে নিচু নিচু গোল গোল খড়ের ছাউনি মিটমিটে কুপির আলোয় চোখে পড়ছিলো, এখানে এসে সে বাসগৃহের পরিবর্তন হয়েছে। খড়ের একচালা, দোচালার মধ্যে হারিকেনের আলো জ্বলছে। এগুলি নিশ্চয়ই বাবুদের থাকবার জায়গা।

মালতীর ছোড়দাদাকে সহজেই পাওয়া গেলো। সে এক দোচালায় হারিকেনের আলোয় একটা টেবিলের সামনে ব'সে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিলো ওভারসিয়ার বাবুর সঙ্গে : দু'জনে যেন যমজ এমন পোশাক। প্রথমে অগ্রাহ্য করলেও একটা লোক প্রায় তিন মাইল পথ এসেছে খবর দিতে এটা বোধ হয় যুক্তি হিসাবে ছোড়দাদার মনে লাগলো। ওভারসিয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে ছোড়দাদা বাড়িতে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

ছোড়দাদা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'জানিস নাকি কি হয়েছে?'

'মুই কি জানও।'

পথে আর কথা হয় নি। ছোড়দাদা টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে চলছে। কিছু পিছনে মাতালু।

নতুন পথ থেকে পুরনো পথের জন্য নামলো তারা। এখানে এসে আবার সেই ধানের ছড়াগুলো পায়ে দ'লে চলতে হবে। ছোড়দার জুতোর তলায় ধানের শিষ স্পর্শ না-দিলেও, মাতালুর খালি পায়ে দিচ্ছিলো। এ অবস্থায় অন্য কারো মনে কি হ'তে পারতো তা কৌতূহলের হ'লেও নিরর্থক। মাতালুর নিজের মনেই ধানের জন্য যে খেদটা জেগেছিলো হয়তো সেটাই তার কাছে আবার ফিরে আসতে পারতো। কিম্বা পথটা এত তাড়াতাড়ি এত কাছে এসে পড়েছে, এই বিস্ময়। তা হলো না। মাতালু ভাবলো : মালতীর ছোড়দা এই সেদিনেও হাফপ্যান্ট-পরা রোগা রোগা একটা বালকমাত্র ছিলো। কিন্তু এখন এই অন্ধকারের অস্পষ্টতার জন্যই এবং কিছুটা হয়তো পোশাকের জন্যও বটে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ব'লেই মনে হচ্ছে। বেশ পোশাক ভাটিয়াদের।

তারপর সে ভাবলো : মালতী কি এখনও অপেক্ষা ক'রে আছে? না-থাকাই সম্ভব। বাড়িতে যদি সত্যই গোলমাল লেগে থাকে তবে

তার পক্ষে বাড়িতে ফিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই কি কিছু ঘটেছে? এমন কি হ'তে পারে মালতীর এটা একটা খেলা; তাকে না-হক খানিকটা ছুটিয়ে নিলো? সে যে বোকা এটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা? তা যদি হয় তা হ'লে গভীর অন্যায় মালতীর, এর জন্য তাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবে না মাতালু।

কিন্তু কিছু দূর গিয়ে মাতালু চিন্তা করলোঃ মালতীর যদি এটা ছলই হ'য়ে থাকে, তা হ'লেই এমন কথা বলা যায় না যে তাকে বোকা প্রমাণ করার চেষ্টাই ছিলো মালতীর। এমনও হ'তে পারে সে নিজে যেমন কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না, তেমনি হয়েছিলো মালতীর। কিছু একটা বলার জন্যই সে বলেছিলো ছোড়দাকে ডেকে আনার কথা। মালতী চিরকালই দুষ্টু, অনেক দুষ্টুমি সে ছেলেবেলায় করতো।

নিজের বাড়িতে ফিরে মাতালু দেখলো মালতী ফিরে গেছে। তার খুব ইচ্ছা হ'লো ডাঙ্গর আইকে সে জিজ্ঞাসা করে মালতী তার জন্য অপেক্ষা করেছিলো কি না। কিন্তু এই সাধারণ কথাটা জিজ্ঞাসা করতে তার লজ্জা বোধ হ'লো, আর কেন সে রকম হ'লো তা সে বুঝতে পারলো না।

দু'একদিন পরে মাতালু মালতীকে দেবার জন্য ফুলমতীর কাছে চাদরখানা চাইতে গিয়ে শুনতে পেলো মালতী সেখানা নিয়ে গিয়েছে।

॥ পাঁচ ॥

আমরা সম্ভবত ভগীরথ বংশের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট। সে জন্য গঙ্গা আনয়নের ব্যাপারটাকেই একমাত্র বক্তব্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি। গঙ্গা এমন কিছু শান্ত বা ধীর নয়। তার গতিপথে শুধু অরণ্যই ছিলো না, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষায় তৈরী গ্রামও ছিলো। সে সব গ্রাম নিশ্চিহ্ন ক'রেই সে এগিয়েছে। কিন্তু পাবনী গঙ্গার কথা বলতে গিয়ে সেই সব নষ্ট-আশা মানুষের কথা চিন্তা করতে পারি না। দু'একজন জহ্নুর কথা হয়তো উল্লেখ করি, কিন্তু সবাই তো জহ্নু নয়।

পিচের পথ কালো নদী দুখিয়ার কুঠির দিকে এগিয়ে এলো। দুখিয়ার কুঠির ঠিক আগের গ্রামে ডেরা পড়েছে কুলি-কামিন ও ওভারসিয়ার বাবুদের। দুই গ্রামের মাঝে কয়েক সারি শাল গাছ। সেটলমেণ্টের ফলে এগুলো এখন সরকারের সম্পত্তি। দু'পাশের গ্রামের চাপে নিশ্চিহ্নপ্রায় আদিম না হ'ক বহু পুরাতন অরণ্যের শেষ কয়েক সারি গাছ। তাদের সাধ্য কি কালো নদীর গতিপথ রুখে দেয়ার। ওপারে গ্রামের বেদনার কথা পরোক্ষভাবে কানে আসে, প্রত্যক্ষভাবে কানে আসে রোলার ইঞ্জিনের তীব্র চিৎকার বনের গাছে কুড়ুল মারার শব্দ। একটা অস্বস্তি বোধ করছে চাষীরা।

একদিন সকালে কাঁকরু দেখতে পেলে তার জমিতে কয়েকজন অপরিচিত লোক প্রবেশ করছে। ক্ষেতভরা হলুদ রং-এর ধান। আর দশ দিনে ধান কাটতে হবে। এ সময়ে জোরে বাতাস বইলে চাষীর প্রাণ ধক্‌ধক্‌ করে ধান ঝ'রে যাবে ব'লে। গ্রামের গোরু বাছুরগুলিকে

যৌথ চেষ্টায় ক্ষেত থেকে দূরে রাখে তারা। সেই জমিতে কিনা মানুষ!

পড়ি-মরি ক'রে ছুটে গিয়ে কাঁকরু দেখলো মানুষ কয়েকটি তার জমিতে খোঁটা পুঁতেছে, খোঁটার গায়ে দড়ি বাঁধা। সে কি? কাঁকরু তাকিয়ে দেখলো তার ডান দিকে অন্য কয়েকজনের জমির উপর দিয়ে খোঁটার মাথায় মাথায় সেই দড়ি এগিয়ে এসেছে। শক্ত কাতার দড়ি। প্রথম করণীয় হিসাবে সে দু-হাতে টেনে দড়ি ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। শক্ত খস্‌খসে দড়িতে তার হাত ছড়ে গেলো, কিন্তু ছিঁড়লো দড়ি। তারপর সে সেই বিদেশী লোক কটির দিকে ফিরে দাঁড়ালো; 'মানসি ন হয় তোমরা?'

লোক কটি বিস্মিত হয়েছিলো কাঁকরুর সাহস দেখে। কিন্তু এর চাইতে কম দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়ালেও অন্য গ্রামের লোকরাও প্রতিবাদ করেছে এর আগে। প্রতিবাদকে অবহেলা করতে তারা অভ্যস্ত। কাজেই তারা ছিঁড়ে দেয়া দড়িটা আবার বাঁধতে লাগলো।

কাঁকরু দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। একা তার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যারা দড়ি বাঁধছে তারা পাঁচ সাতজন, কিন্তু দূরে তাদের দলের অন্য অনেককে দেখা যাচ্ছে। কাঁকরু তখন গ্রামে খবর দেয়ার জন্য চ'লে গেলো। তার পথের দু'পাশে বিমূঢ়-উত্তেজনার সাড়া প'ড়ে গেলো। প্রথম উত্তেজনায়, যাদের জমি দড়ির বাঁধনে পড়েছে, তারা চেঁচামিচি করলো তারপর লাঠি হাতে দল বেঁধে অগ্রসর হ'লো। তাদের দলে কাঁকরুর দাদা চ্যারকেটুও ছিলো। কিন্তু কাঁকরু মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলো সাত আটজন চাষী লাঠি যত শক্ত ক'রেই ধরুক অসংখ্য কুলি-কামিনের সম্মুখে তারা দাঁড়াতে পারবে না। পরন্তু সে দেখতে পেলো টুপি মাথায় সাহেবি পোশাক পরা কে একজন কুলি নিয়ে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ প্রতিরোধের ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু হিংস্রতা ছিলো না তাতে। সাহেবকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই হিংস্রতা দেখা দিলো কাঁকরুর মনে।

হাতের লাঠি ঘরে রেখে, চালে গোঁজা গুড়াল বাঁশ (বাঁটুল) হাতে করলো সে ; কোঁচড়ে ভ'রে নিলো পাথরের কুচি, আগুনে পুড়িয়ে শক্ত-করা মাটির গুলি, তারপরে উঠে দাঁড়ালো তার গোয়াল ঘরের পাশে গোয়ালের পুঁজে। নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রেখে সে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ালো। সাহেব আওতার মধ্যে আসতেই সে বাঁটুল টেনে ছেড়ে দিলো প্রথম গুলি। টুপিতে লাগলো সাহেবের। সে ভেবেছিলো হঠাৎ কিছু একটা পড়েছে। সে বেশ কায়দা ক'রে চাষীদের সম্মুখে বিপক্ষের বিজয়ী সেনাপতির মতোই দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু প্রতি আধ মিনিটে একটা ক'রে গুলি ছুটতে লাগলো কাঁকরুর বাঁটুল থেকে। সব সমেত তিন মিনিট ; একটু দূরে ব'লে নিশানা ঠিক হচ্ছিলোনা, বাঁটুলের বাখারিটা শক্ত হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লেও বটে জোর তত ছিলো না গুলির। কিন্তু মুখের উপরে গোটা তুই লাগতেই সাহেব উর্ব্বশ্বাসে পালালো। তখন তার নাক বেয়ে রক্তও পড়ছে। দলপতি পালাতেই তার সৈন্যদলও পৃষ্ঠভঙ্গ দিলো। কাঁকরু সেই কুলি-কামিনদের মধ্যে অবিরত গুলি ছুঁড়তে লাগলো তার বাঁটুল থেকে। সবগুলো লক্ষ্যে পৌঁছলো না, কিন্তু কয়েকটি কুলিদের গায়ে মাথায় পিঠে গিয়ে লাগলো। তারা দৌড়তে সুরু করলো।

যে চাষীরা লাঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছিলো তারা বিস্মিত হলো, কিন্তু তখন বিস্ময় নিয়ে আলোচনার সময় ছিলো না। কুলি কামিনরা পালিয়েছে বটে আবার হয়তো এখনই ফিরবে। তারা বুঝতে পেরেছে বিদেশীরা তাদের লাঠির ভয়ে পালায় নি। এই বিদেশী বা ভাটিয়ারা কোথা থেকে জোর পায় কে জানে, কিন্তু এরা বাধা পেলেও থামে না, অধিকতর হিংস্র হ'য়ে ওঠে। চাষীদের তু'একজন ডাঙ্গর আই-এর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলো, কিন্তু বাকি চার পাঁচজন স্থির করলো জমিগুলিকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রই করতে হয় তবে ধান কেটে নেয়াই ভালো। অসময়ে কাটার ফলে কিছু ধান কাঁচা থাকবে, ফসল নষ্ট হবে, কিন্তু

এছাড়া কিই বা করার আছে। তারা বাড়িতে লাঠি রেখে প্রতিবেশী-দের ডেকে কাস্তে হাতে ধান কাটতে ছুটলো।

কাঁকরু তার গোয়ালের পুঁজ থেকে নামলো। ক্রোধ ও হিংস্রতাকে প্রকাশ করতে পেরে তার মন তখন খানিকটা শান্ত হয়েছে, এবং তার ফলে উত্তেজনার অবসাদের মতো নানা দুশ্চিন্তা তার মনে ভিড় ক'রে আসছে। একবার তার মনে হ'লো মাতালু যদি থাকতো তার পাশে বাঁটুল নিয়ে, ওদের মনে তা হ'লে এ গ্রাম সম্বন্ধে আরও খানিকটা সমীহ জাগিয়ে দেয়া যেতো। মাতালুর বাঁটুলের লক্ষ্যভেদ দেখার মতো। কিন্তু যারা কালো নদীর প্রবাহপথের বাধা দূর ক'রে ক'রে রাজধানী থেকে এতটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা পাখি নয় যে পাখি-তাড়ানো বাঁটুল দিয়ে তাদের তাড়ানো যাবে। তারা একটা গভীর অন্যায় করছে, কিন্তু কোথায় এর প্রতিকার অধিকাংশ জমিতে চাষীরা ধান কাটতে বসেছে সেও কি তাদের মতোই অপরিপক্ক ধান কাটবে ?

যারা ডাঙ্গর আই-এর বাড়িতে গিয়েছিলো পরামর্শ করতে, তারা ফিরে এলো মাতালুকে সঙ্গে ক'রে। বলা বাহুল্য, পরামর্শ ক'রে তারা কোন উপায় বার করতে পারে নি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার। বরং তারা যখন দেখলো অন্য চাষীরা ধান কাটতে গেছে তারাও কাস্তে নিয়ে জমির দিকে চ'লে গেলো।

কিন্তু মাতালুর মন ভালো ছিলো না। ব্যাপারটা শুনে তার মনে হয়েছিলো কাঁকরু না-জানুক সে নিজে মাটি চাপাপড়া ধানের শিষ দেখে এসেছিলো এর আগে। সে যদি ইতিপূর্বে সে কথা কাঁকরুকে বলতো, গ্রামের চাষীদের সঙ্গে আলাপ করতো তা হ'লে হয়তো এমন আশু বিপদের মুখে এমন বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়াতে হ'তো না। এখন এরা ধান কেটে নেয়ার সময় পাবে কিনা সন্দেহ। প্লাবনের মুখে জমি যাবেই, আগে থেকে জানতে পারলে হয়তো ওভারসিয়ার সাহেবের

সঙ্গে দরবার ক'রে কয়েকটি দিন সময় নেয়া যেতো, ধানগুলো পাকার সময় পেতো।

কাঁকরু কাস্তে নিয়ে বেরুচ্ছিলো, দরজার কাছে মাতালুর সঙ্গে দেখা হ'লো তার।

'কাঁকরুরে, ভাটিয়ারা ঘর গেইছে, মনৎ হয় আইসবে ফিন্।'

'আইসবে তো।'

'কোটে যাস্, ধান কাটিবার?'

'করঙ কি আর?'

তাই তো এ ছাড়া কি করার আছে?

'কাঁকরুরে, ধান এলাও পাকে নাই।'

'নাই-পাকে।'

'জমি ধরি নিবে, বা। রুখিবার কোন নাই রে?'

কেউ নেই, কোন উপায় নেই রুখবার। কাঁকরুর চোখ দিয়ে বড়ো-বড়ো কয়েক ফোঁটা জল পড়লো। জমি তো নেবেই, ধান কেটে আনতে পারবে এমন ভরসাও ক'মে আসছে।

মাতালুর মনে বেদনাটা প্রতিকারের পথ খুঁজছিলো, তার কথা বলার প্রায় শান্ত স্বর থেকে তার মনের উত্তাপ বুঝবার উপায় ছিলো না। কিন্তু চির অভ্যস্ত সংযত আলাপেব মধ্যে কাঁকরুব নিগূঢ় বেদনা যেমন নিঃশব্দ অশ্রুজলে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, তেমনি আকস্মিক ভাবে প্রকাশ পেলো মাতালুর ক্রোধ।'

'মুই গদাধরপুর যাঙরে, নায়েব আহিলকারক ধরি আসিম। তাঁয় না খাজনা খায়।'

কাঁকরুর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিলো কাছে। সে বললো, 'না আইসে তায়।'

ততক্ষণে মাতালুর কপালের শিরাগুলি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বুক ওঠা-পড়া করছে। সে বললো, 'না-আইসে? মারি দেঙরে, ঠ্যাং

তুলিয়া মুখৎ মারিম্।'

পৃথিবীতে অনেক অন্যায় ঘটছে, তার প্রতিকার করার জন্য স্বর্গের রাজসভায় গিয়েছে এবং প্রতিকার না-পেয়ে সেই রাজসিংহাসনে পদাঘাত করেছে, পুরাণে এমন কোন মুনিকুমারের কাহিনী যদি থাকে আমার তা জানা নেই। মাতালু ধনী কাঁকরুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গদাধরপুরের দিকে হাঁটতে সুরু করলো। তার দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। অন্তরের প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য ফুটে উঠেছে তার ভঙ্গিতে। দু' একটি অজ্ঞাত ভয়, নিজের শক্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু অবিশ্বাস তার অন্তরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধানের ক্ষতির সঙ্গে বন্ধু কাঁকরুর বিপদ জড়িত। অধিকন্তু, তার কেবলই মনে হচ্ছে, যে সময়ে সে ব্যাপারটা প্রথমে জানতে পেরেছিলো তখনই যদি গ্রামবাসীকে সতর্ক ক'রে দিতো, হয়তো এমন দুঃসময় উপস্থিত হ'তো না। একটা অনুশোচনা যেন।

নায়েব আহিলকারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো এবং তার আগে তার প্রতিজ্ঞা কঠোর মনে কিছুমাত্র শ্লথতা আসে নি। শুধু একটা হাসির ব্যাপার ঘটেছিলো। এবং তার ফলে কিছুক্ষণের জন্য তার মন প্রায় স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিলো। নায়েব আহিলকারের কাছে বলবার কথাগুলি মনে মনে গুছিয়ে নেবার সুযোগই হ'লো তাতে। গদাধরের খেয়া নৌকায় উঠে মাতালু দেখতে পেলো, যাত্রীদের মধ্যে একজন একটা টুলে বসেছে। প্রথা অনুসারে গণ্যমান্য যাত্রীর জন্য ঘাটিয়াল এমন টুল পেতে দেয়। টুলের উচ্চতায় ব'সে যে যাত্রী তার পদমর্যাদার হিমালয়ত্ব রক্ষায় ব্যস্ত তার মুখ ছাতা দিয়ে আড়াল করা। কিন্তু নৌকা ঘুরতেই রোদ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় ছাতাটা সরিয়েছিলো যাত্রীটি, তার ফলে তার মুখ দেখতে পেলো মাতালু। মালতীর ছোড়দাদার বন্ধু সেই ওভারসিয়ার। কিন্তু মাতালু চিনতে না-পারলেও অন্যায় হ'তো না। ওভারসিয়ারের নাক ও একটা চোখ

ভীষণ ভাবে ফুলে আছে, গালে ও জামার বুকে শুকনো রক্ত। মাতালুর কৌতূহল হয়েছিলো, কিন্তু কাঁকরুর বাঁটুলে এ রকম হয়েছে এ না জানলেও সে অনুমান করলো হয়তো বা কোন চাষীর লাঠির আঘাতেই হয়েছে। হঠাৎ তার হাসি পেলো, ওভারসিয়ার উচ্চাসনে বসেছিলো ব'লেই হয়তো।

মাতালু নায়েব আহিলাকারকে পেলো তার কুঠিতে। সংক্ষেপে সোজা ভাষায় ধানের অপমান ও চাষীদের ক্ষতির কথা বর্ণনা ক'রে মাতালু বললো, 'ইগুলা মানসি না হয়, মানসির লক্ষণ নাই দেখও।'

এই বাংলা দেশে একটা প্রথা আছে এই যে, জমি বেদখল বা ধান নষ্ট করার নালিশ রাজপুরুষদের কাছে খুব বেশী আমল পায় না। এবং বিচারের পদ্ধতিও এত জটিল যে মামলা ক'রে ফল পেতে-পেতে নষ্ট করা ধান একেবারে মাটিয়ে যায়, বেদখল করা জমিতে ফসলের নতুন খন্দ ওঠে। কাজেই যতক্ষণ না এসব একটা ফৌজদারী মামলা করার মতো খুন জখমের অপরাধে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে রাজপুরুষরা গুরুত্ব দিতে চায় না। মাতালুর নালিশ শুনে নায়েব আহিলকার, সুতরাং, কি করতো তা বলা কঠিন।

এ ক্ষেত্রে কিন্তু নায়েব আহিলকারকে বিচলিত করার একটা কারণ ছিলো। নায়েব আহিলকার তার পদাধিকার বলে মহকুমার মালিক, এবং অপ্রচলিত হ'লেও একমাত্র তারই উপাধি এস-ডি-ও হ'তে পারে। কিন্তু তার কানে এসেছে রাস্তা তৈরি করার ওভারসিয়ারকে তার অধস্তন কর্মচারীরা এস-ডি-ও ব'লে উল্লেখ করে। এবং মাতালু যখন তার নালিশ জানাচ্ছিলো ঠিক তখনই দরজা-দার চাপরাসী এসে বললো,—এস-ডি-ও সাহেব এসেছেন দেখা করতে।

নায়েব আহিলকারের মুখে বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিলো। সে চিরতা খাবার মত মুখ ক'রে বললো, 'আসতে বলো।'

দুই এস-ডি-ও'র সাক্ষাৎ খুব কৌতুককর হ'তে পারতো। কিন্তু

নায়েব আহিলকারের কর্তব্য তালিকা থেকে আর যাই বাদ দেয়া যাক অফেন্স এগেইনস্ট পার্সনকে উপেক্ষা করা চলে না। কাজেই ওভারসিয়ার যখন নায়েব আহিলকারের প্রথা সম্মত হাড়ুডু-র উত্তরে নিজের দৈহিক অবস্থার কথাই বললো, নায়েব আহিলকারকে উপেক্ষার উত্তুঙ্গতা থেকে নামতে হ'লো।

ওভারসিয়ার বললো, 'কে মেরেছে বলতে পারব না, পাঁচ ছ'জন লোক গুলতি জাতীয় কিছু দিয়ে পাথর ছুঁড়েছিলো এই আমার অনুমান।'

মাতালু ভাবলোঃ তা হ'লে বাঁটুলের ব্যবহারই হয়েছিলো। কিন্তু কাঁকরুদের পাড়ায় কাঁকরু ছাড়া এমন টিপ ক'রে বাঁটুল ছাড়বার আর কে আছে। পাঁচ ছ'জন নয়, কাঁকরুরই কাজ। এতো পাখি মারা নয় যে টিপ কবতে হবে। ওভারসিয়ারের মতো একটা বড়ো জানোয়ারকে লক্ষ্য করা। রাগের মাথায় মিনিটে দু'তিনটি গুলি ছোঁড়া কাঁকরুর পক্ষে কঠিন নয়।

নায়েব আহিলকার ভাবলোঃ এস-ডি-ও হবার দুরাশা এমন ভাবেই মিটবে তোমার একদিন। হুঁ-হুঁ, এ বাপু দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া, তোমার মতো সড়ক তৈরী করা নয়।

সে গম্ভীর মুখে বললো, 'পিনাল কোড ব'লে বই আছে একখানা। তা'তে বলে মারলেই অপরাধ হয় না। দেখতে হবে চাষীরা আত্মরক্ষার জন্য মেরেছে কি না। আপনি এবং আপনারা কি করেছিলেন জানা দরকার।'

ওভারসিয়ার দ্বিধা করতে লাগলো।

সেই অবসরে নায়েব আহিলকার ভাবলোঃ এজলাসে বিচারপ্রার্থী হ'য়ে যদি দাঁড়ায় ওভারসিয়ার, দুই এস-ডি-ও'র পার্থক্যও সুপ্রমাণিত হ'য়ে যাবে।

ওভারসিয়ার বললো, 'আপনি কি চান সড়কের কাজ বন্ধ ক'রে

দেয়া হ'ক ?'

'তা কেউ চায় না। তাই ব'লে আধপাকা ধানের উপরে মাটি চাপানোও সকলে সমর্থন করবে না।'

'ওরা তো ক্ষতিপূরণ পাবে পরে।'

'কতটা ক্ষতি করলেন তাকি লিখে রাখছেন ? ক্ষতিপূরণ :দেবার সময়ে কি ধানের দাম ধরবেন ?' নায়েব আহিলকার সিগারেট ধরালো।

'ওসব ব্যাপারের ভার আপনাদের। আমি একটু তাড়াতাড়ি এগিয়েছি বটে। কিন্তু যদি পদে পদে এরকম বাধা পাই তবে শীতকালেও গদাধর নদী পর্যন্ত পৌছুতে পারব না। অথচ, আপনি জানেন কিনা জানি না, রাজধানী থেকে ওঁরা কয়েকজন সড়কের অগ্রগতি দেখবার জন্য আজকালের মধ্যেই আসবেন। এবং আমি যতদূর জানি আমার কাজকে সব রকমে সাহায্য দেবার নির্দেশ হয়তো আপনার দপ্তরেও এসেছে। আমার রিপোর্টে আমি এদিকের সব কথাই লিখব।'

নায়েব আহিলকার এ ইঙ্গিতটায় ক্রোধভরে বললো, 'তা আপনি করবেন, আমিও তদন্তে যাব। আপনার সম্মুখেই একজন উপস্থিত। যাও, মাতালু আমি আজকালের মধ্যেই চুখিয়ার কুঠিতে যাচ্ছি।'

ওভারসিয়ারও উঠে দাঁড়ালো। সে যে কম নয় তার প্রমাণ-স্বরূপ এ অঞ্চলে যা কেউ করে না, নায়েব আহিলকারের সামনে তেমনি ক'রে মুখে সিগারেট গুঁজে তাতে কায়দা ক'রে আগুন জ্বাললো।

নায়েব আহিলকারও তাকে উপেক্ষা করার জন্য বললো 'দরকার হ'লে আপনার আঘাতের কথা আপনি পুলিসকে জানাবেন, থানায় এজাহার দেবেন। আমি বিচার করবো। আমার কাছে আসবার

দরকার নেই। কনটেমপ্ট অব কোর্ট ব'লেও একটা কথা আছে।'

বিষয়টার পরিসমাপ্তিতে খানিকটা নাটকীয়তা দেখা দিলো। মাতালু ও ওভারসিয়ার একই খেয়াতে গদাধর পার হয়েছিলো, কিন্তু নিজেদের মধ্যেকার সামাজিক, ঘটনা গত ব্যবধানটা প্রমাণ করার জন্য ওভারসিয়ার মাতালুর বিশ-ত্রিশ হাত আগে আগে চলেছিলো। প্রথমে অপরিচিত একটা তীব্র শব্দ শোনা গেলো, তারপরে সেই শব্দকে অনুসরণ ক'রে ঘটনাটা ঘ'টে গেলো।

পথের দু'ধারে বড়ো বড়ো গাছ। একখানি লাল রং-এর মনোপ্লেন যেন সেই গাছগুলোর উপরে নেমে পড়বার জন্য ছুটে এলো। মাতালু জীবনে এই প্রথম দেখলো এরোপ্লেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে সে বোবা হ'য়ে গিয়েছিলো, আত্মরক্ষার তাগিদে পথের ধারের গাছগুলো ঘেঁষে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলো। সে অবস্থা থেকে সে বুঝতে পারলো, সেই লোহার জটায়ু-রাক্ষস এদিককার কোন গাছে বসে নি, বরং যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে। আর সবটুকু লক্ষ্য করতে না পারলেও তার মনে হ'লো ওভারসিয়ার বাবু সেই হাওয়াই জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে কথা-বার্তা বললো।

বস্তুত ওভারসিয়ার মাতালুর মতো অশিক্ষিত আদিবাসী নয় যে ভয় পাবে। এরোপ্লেন দেখে সে বুঝতে পেরেছিলো কানাঘুষোয় যে কথাটা শোনা যাচ্ছিলো এতদিনে সেটা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ পথের অগ্রগতি দেখবার জন্য রাষ্ট্রপালক নিজে বেরিয়েছেন। এরোপ্লেন 'পাঁচ-সাতশ' ফিট ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো, মাতালুর যতই মনে হ'ক সেটা গাছে নামবার চেষ্টা করছে। তা হ'ক, ওভারসিয়ার টুপি খুলে উর্ধ্ব দৃষ্টিতে গদ্ গদ ভঙ্গিতে হাতজোড় ক'রে বললো, 'কিছু বললেন স্যার? হ্যাঁ, এদিকের খবর সব ভালো। শীতের আগে গদাধর নদীতে পৌঁছে যাব, ইওর ম্যাজেষ্টি।' কথাগুলো সে প্রাণপণ চিৎকার ক'রে বলতে লাগলো। যেন সে এরোপ্লেনের প্রবল শব্দের সঙ্গে পাল্লা

দিয়ে তার বক্তব্যকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। অতি সম্ভ্রম বোধ থেকে তার পা কাঁপছে ঠকঠক্ ক'রে।

মাতালু তার সব কথা শুনতে না পেলেও তার ধারণা হ'লো সে· আকাশযাত্রীর কাছে কিছু বললো এবং যেহেতু আজ সকালেই তুখিয়ার কুঠিতে একটা গোলমাল হয়েছে, স্বাভাবিক ভাবেই সে খবরটাই সে দিয়েছে। মাতালুর মনে যে আত্মরক্ষার তাগিদটা এসেছিলো সেটা তখন কেটে গেছে, বরং জীবনে প্রথম এরোপ্লেন দেখবার আনন্দটা ফুটি-ফুটি করছিলো। নতুন এই চিন্তা তার মনে দেখা দিলো: ওভারসিয়ার তাহ'লে হার স্বীকার করবে না। বরং এই এরোপ্লেনের ঘটনা থেকে বোঝা গেলো অসীম শক্তিমান আকাশ-পথযাত্রী রাজশক্তি তার পৃষ্ঠপোষক। হায়, বাঁটুল দিয়ে তুমি পাখি মারতে পার, কিন্তু লোহার তৈরী ওই আকাশরথের কি করতে পারবে? অসহায় পরাজয়ের বেদনায় মাতালুর অনুভবগুলি ডুবে যেতে লাগলো।

মাতালু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। নায়েব আহিলকার তদন্তে আসে নি। তার না-আসার নানা কারণ থাকতে পারে।

চাষীরা অপরিপক্ক ধান কেটে ঘরে তুলেছে। অর্ধেক টিকবে কিনা বলা যায় না। অনেকেরই জমির উপরে এক মানুষ সমান মাটি ফেলেছে রাস্তা করনেওয়ালারা। জমি এবং সড়কের আপেক্ষিক অবস্থান অনুসারে কারো কম কারো বেশী জমি দখল করেছে সড়ক। নদীর বন্যা এক সময়ে নেমে যায়। যখন সে পলির বদলে বালি দিয়ে যায় তখনও চাষীরা ভরসা করে, আর এক বন্যায় ভাগ্য পরিবর্তন হ'তেও পারে। কিন্তু এই কালো-নদীর ক্ষেত্রে তা হবে না।

কাঁকরুর সব সমেত ছ-সাত বিঘা জমি ছিলো। সড়কের গতিপথের তলে তার ভাগ্য এবং জমির অধিকাংশ চাপা পড়েছে।

কশ বেয়ে গড়িয়ে-পড়া ভুক্তাবশেষের মতো সড়কের দু'পারে এখানে এক কাঠা ওখানে আধ কাঠা জমি হয়তো বা সে খুঁজে পেতে পারে। কাঁকরু ভূমিহীন হ'য়ে গেলো। তার কথায় লোকের আবার সেটলমেণ্টের কথাই মনে পড়ে। অরণ্য থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার সুযোগ আর নেই যে ভূমিহীন নিজের বাহু দুটিকে ভরসা ক'রে আশ্বাস পাবে।

কাঁকরুর সঙ্গে মাতালুর একদিন দেখা হয়েছে ইতিমধ্যে। কিছুক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে আলাপ ক'রে জমির কথায় এসে পৌঁছতেই মাতালু বললো, 'ক্ষতিপূরণ দিবে রে, বা।'

'হয় নাকি ?' কাঁকরু হাসবার মতো মুখভঙ্গি করলো।

সে শুনেছে ক্ষতিপূরণের কথা, কিন্তু ভাটিয়াদের ন্যায়বোধের উপরে তার বিশ্বাস চূড়ান্ত ভাবেই মুছে গেছে। আর তা ছাড়া স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে তার বদলে কেউ যদি তোমাকে টাকা দিতে চায় ?

মাতালু চুপ ক'রে থেকে বিষয়ান্তরে যাবার চেষ্টা করতে লাগলো। এ ধানের খন্দ থেকে কয়েক মাস খাওয়া পরা চলবে তারপর কাঁকরু কি করবে তার শিশু দুটি এবং স্ত্রীকে নিয়ে ! কিন্তু এ সব বিষয় নিয়ে আলাপ করতে রাজী নয় কাঁকরু। চিরস্থায়ী অভ্যাসের ফলে এখনও তার মুখে হাসির মতো একটা ভঙ্গি দেখা দেয়। সেটা হাসি নয়। দেখতে দেখতে তার কপালের পাশে শিরা ফুলে ওঠে, তার চোখ দুটিতে দৃষ্টির পরিবর্তন হ'তে থাকে।

বন্ধুকে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে আলাপের মাঝখানেই কাঁকরু চলে গেলো।

কাঁকরু চ'লে গেলে মাতালুর মনে হ'লো, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার।

পরিস্থিতিটা তার কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে। চাষীদের সঙ্গে ওভারসিয়ারের বিবাদ কারো অজানা ছিলো না। মালতীও

শুনেছিলো। মালতী বলেছে, 'ওতে ভালোই হবে, মাতালু। হাজার বর্ষা-বাদলেও রাস্তায় আর কাদা হবে না। এরপরে দেখবে ওই রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি চলবে। সকাল বেলায় গিয়ে তুপুরের আগেই সদর থেকে ফিরে আসবে লোকে।'

দেখাটা হঠাৎ হয়েছিলো। মালতী যতক্ষণ কথা বলছিলো মাতালু তার ঠোঁট তুটির ভাঙা-গড়াই দেখছিলো। সে দেখতে পেলো মালতীর ওপরের ঠোঁটের কোল ঘেঁষে একটা ছোট তিল আছে। সে ভাবছিলো এর আগে কি কোনদিন তিলটি এমন ক'রে চোখে পড়েছে তার ! মালতী থামলে মাতালু কথাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বললো, 'সম্ভব।'

শুধু মালতী নয়, ভাটিয়ারা সকলেই আনন্দিত হয়েছে রাস্তার অগ্রগতি দেখে। তাদের আলাপ শুনলে মনে হয় কোথায় যেন একটা আত্মিক যোগ আছে তাদের সঙ্গে ওই সড়কের। কিন্তু সকাল বেলায় গিয়ে তুপুরের আগেই সদর থেকে ফিরে আসার কি সার্থকতা আছে এটা মাতালু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না।

কথাটা সভ্যতা এবং তার অগ্রগতি। এ ক্ষেত্রে রাজপথের অগ্রগতিতে সভ্যতার গতিটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু কি লাভ তাতে, কাকে সে লাভবান করে ?

মালতী বলল, 'আমি যাই এখন, কাজ আছে।'

'তা যাও। কিন্তু মুই বুঝির পাই না কাঁকরুর কি হইবে।'

কাঁকরু মালতীর পরিচিত। কাঁকরুর নিঃস্ব হওয়ার কথা সে শুনে থাকবে। হয়তো কিছু বেদনাবোধও করেছে তার জন্য। সান্ত্বনা দেয়ার মতো মধুর ক'রে হেসে দেশী ভাষায় সে বললো, 'হইবে কোন একটা।'

মালতী চ'লে গেলে মাতালু কিছুক্ষণ ভেবেছিলো। কিছুক্ষণ ধ'রে মালতীর কথার সুরে যে আশ্বাস ছিলো সেটা তাকে তুশ্চিন্তা

থেকে দূরে রেখেছিলো, কিন্তু পরে এক সময়ে সে নিজের কাছে স্বীকারোক্তি করেছিলো: বুঝির পাই না ইয়াৎ কার লাভ অলাভ হইবে।

কাঁকরুর তীব্র প্রতিবাদের একটা ফল দেখা গেছে। শুধু রাস্তার জন্য জমি দখল করা নয়, ছাউনির জন্যও তারা যেখানে সেখানে জমি দখল করতো, চলাচলের জন্য তারা সে জমির উপর দিয়ে পথ ক'রে নিতো। তুখিয়ার কুঠিতে তারা এ স্বেচ্ছাচারগুলি থেকে বিরত হয়েছে। আসল ছাউনিটা পড়েছে রাস্তার উপরে, কিছু শ্রমিক তুখিয়ার কুঠির আগের গ্রামে পুরনো ছাউনিতে বাস করছে, কিছু এগিয়ে গিয়ে তুখিয়ার কুঠির পরের গ্রামে ছাউনি ফেলার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে। দখলকারী শত্রুসৈন্যের মতো শ্রমিকরা ঘোরাফেরা করে না তুখিয়ার কুঠিতে যেমন অন্য গ্রামে করতো, বরং কষ্টে দখল করা নালায় সন্তর্পণে বাস করছে যেন।

তবু মন্দের ভালো, এই ভেবেছিলো মাতালু। কাঁকরু, তার দাদা চ্যারকেটু, ফুলবর এবং রংবরকে নিয়ে একটা পরামর্শ সভা ক'রে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন ইত্যাদি করা উচিত হবে কিনা তা স্থির করবে, এই ভেবেছিলো সে। তারই সূচনায় সে একদিন কাঁকরুকে ডেকে নিয়ে এক মাঠের আলে জনান্তিকে বসেছিলো। আলোচনাটা অগ্রসর হ'তে পারছিলো না। কিছুদূর গিয়েই বিদ্বেষের বিশৃঙ্খল চিন্তায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলো তারা। মাতালুর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিলো কাঁকরু একলা বাঁটুল ধরেছিলো ব'লে এ গ্রামে শ্রমিকরা বসতে সাহস পায় নি, যদি সেও দাঁড়াতো কাঁকরুর পাশে হয়তো পথটা তুখিয়ার কুঠির বাইরে দিয়েই ঘুরে যেতো।

ঠিক এমন সময়ে দেখতে পেলো মাতালুরা তাদের বাঁয়ের দিকের

গ্রাম্য পথটি দিয়ে মালতীর মেজদার সঙ্গে সাহেবি পোশাক-পরা কে একজন যাচ্ছে। তাদের আলাপ শোনা গেলো না, কিন্তু তাদের হাসির শব্দ দু-একবার উড়ে এলো। সাহেবি পোশাক-পরা লোকটিকে চিনতে পারলো কাঁকরু। তার মুখের চেহারার পরিবর্তন হ'লো।

মালতীর মেজদার সঙ্গে লোকটি যখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের গন্তব্য যে মালতীদের বাড়ি তা ধ'রে নেয়া যায়। মাতালুর মনের মধ্যে একটা অচেনা আবেগ ছটফট করতে লাগলো। যেন তার বুকের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে ওভাবসিয়ার, ঠিক যখন সে ভাবছিলো অনেক দূরে আছে সে এবং হয়তো তাব কথা ভুলে যাওয়া যাবে।

এরপরে কাঁকরু কিংবা মাতালু কেউ কথা বলতে পাবলো না। তারা উঠে বাড়ির দিকে রওনা হ'লো।

কিন্তু সন্ধ্যার পর রংবর যখন গরুগুলোকে রাত্রির মতো বেঁধে দিয়ে চ'লে গেছে, মাতালু আবার তার নিঃসঙ্গ বোধটায় ফিরে এলো। সেই নিঃসঙ্গতা নির্জন নয়, সাহেবি পোশাক পরা অনেক ওভাবসিয়ার সেই জগতে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছে শান্তিকে পীড়িত ক'রে।

আমি ফরেষ্টারদের কাছে শুনেছি হরিণদের চরার মাঠে ফরেষ্টাররা বাংলো তুললে অনেক রাত্রিতে সে সব বাংলোর কাছে হরিণরা এসে খোলা জানালায় উঁকি দিয়েও দেখে।

মাতালু যখন মালতীদের বাড়ীর কাছে গিরে পৌঁছালো তখন রাত্রি হয়েছে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, জোনাকির ঝাঁক বাতাসে ভাসছে। আকাশে একফালি চাঁদ, তাই রত্রির অন্ধকারটা স্বচ্ছ। মালতীদের বাড়ির সদরের দিকের রেলিংঘেরা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে ওভারসিয়ার ও মালতীর ছোড়দাদা এবং মেজদাদা গল্পগুজব করছে। মাতালু এর আগে একদিন যে জানালাটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো,

আজও নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো।

আজ মালতীর পান সাজা হ'য়ে গিয়েছিলো। হারিকেনের আলোয় সে চটের উপরে সূতোর ফোঁড় তুলে-তুলে একটা আসন সেলাই করছিলো। মাতালুর পায়ের তলায় শুকনো পাতা মড়-মড় ক'রে উঠতেই মালতী চমকে উঠলো।

'কি? চমকে দিয়েছ।'

মাতালু কিছু বললো না, আসার কোন ওজর সে তৈরি করতে পারলো না।

সে লক্ষ্য করতে লাগলো পান খেয়ে ঠোঁটের উপরে কি রকম লাল একটা রেখা পড়েছে মালতীর, ছোট ছোট দাঁতগুলি কেমন লাল রং নিয়ে ঝকঝক করছে। দীঘল গড়নের এই কালো মেয়েটির মতো এমন আর কে আছে?

'কিছু বলবে?' ব'লে জানালার কাছে এগিয়ে এলো মালতী।

মাতালু একটা কথাও বলতে পারলো না। কিন্তু তার চোখ দুটি থেকে আজ মালতী নিজের চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হ'লো। শাস্ত্রে একেই কি প্রথম দর্শন বলে? যার সঙ্গে রোজ দেখা হচ্ছে আকস্মিক ভাবেই এক বিশেষ মুহূর্তে তার ক্ষেত্রেও এই প্রথম দর্শনের ঘটনাটা ঘটে? তা যদি হয় তবে সে দৃষ্টিতে কান্ত কোমলতা যত থাকে ঠিক ততখানি থাকে সম্ভাব্য প্রতিযোগীর প্রতি অসহিষ্ণুতা।

এ রকম অবস্থায় মাতালুর মনে হ'লো ভাটিয়াদের মধ্যে খুব ভালো লোক কেউ কেউ আছে, তারা যা কিছু করছে সবই খারাপ নয়। সুতরাং কাঁকরু আজ কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিছু সময়ের মধ্যে ভাটিয়ারাই তার একটা ব্যবস্থা করে দেবে হয়তো। রংবরকে একথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো সে। অবশ্য রংবর তার এ ধরণের ইঙ্গিতে সায় দেয় নি। রংবরের অনুভব হয়—অনির্দেশ্যকে লক্ষ্য ক'রে এগিকে যাচ্ছে এই

কালো পথ। নিজের খেয়ালে সে তুখিয়ার কুঠির দিকে এগিয়ে এসেছে, দূর দিয়ে ব'য়ে গেলেও কিছু বলবার ছিলো না। কিন্তু যে আদিবাসীদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নেই এই পথের তাদের ভাগ্যদোষেই, যেন পথটা এত কাছে অবস্থান করছে। আর সে অবস্থানের ফলে গদাধরের জলের মতো এই কালো প্রবাহও তাদের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হ'য়ে যাবে। কিন্তু গদাধরের রক্তধারাকে মলিন করে না। তার প্রবাহ কালো নয়।

॥ ছয় ॥

সভ্যতার অগ্রগতি কারো জন্যই থেমে থাকে না। সড়কও দেখ-দেখ ক'রে গদাধরের তীরে গিয়ে পৌঁছালো। তারপর একদিন বিলাসপুরী এবং আজমগড়ের শ্রমিকরা দলে দলে খেয়া পার হ'য়ে চলে গেলো। দুখিয়ার কুঠির লোকেরা ভেবেছিলো ভিন্ দেশীরা এবার ক্রমে ক্রমে দূরে স'রে যাবে। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মতো পথটা শুধু পড়ে থাকবে।

কিন্তু দুধ নিতে এসে আন্তাজ একদিন বললো, 'দুধর দাম বাড়ি যেইছে, বা।'

'কেনে রে?'

'গাহাক বেশি হইছে।'

গ্রাহক বেশি হ'লে দুধের দাম বাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্য দিয়ে আন্তাজের মনোভাবকে সবটুকু ধরা যায় না। সে দাম চড়িয়ে দুধ কিনতে চায়।

'তা দর চড়াবু কেনে?'

'না হয় তো দুসরা-দুসরা লোকক দুধ দিবেন তোমরা।' বাড়তি দামে দুধ কিনেও সে ব্যবসাটাকে একচেটিয়া ক'রে রাখতে চায়।

'ঠিকে তো।' রংবর সায় দিলো আন্তাজের কথায়।

আন্তাজ দুধের দাম চড়িয়ে দিয়েও আগের চাইতে বেশি ক'রে দুধ কিনছে। অন্য অন্য দুধের ব্যবসায়ী গ্রামে এসেছে কিনা তা মাতালু জানতে পারে নি। সে নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে দুধটা

রাখতো একদিন কথায় কথায় আন্তাজ সেটুকুও কিনতে চেয়েছিলো।
মাতালু হেসে বলেছিলো—ভাগ্।

কিন্তু কাঁকরুর বাড়ির সংবাদ অন্য রকম। এর আগে সে দুধ বিক্রি করতো না। আন্তাজ এখন তাকে দুধ বিক্রী করতে রাজী করেছে। কাঁকরুর দুটি শিশু। তার স্ত্রী আপত্তি তুলেছিলো, 'বাচ্চা খাইবে কি ?'

'কেনে তোর বুকে দুধ নাই।'

তার স্ত্রী তর্ক না ক'রে মুখ নিচু ক'রে রান্নার লকড়ি সংগ্রহ করার জন্য বেরিয়ে গেলো। কাঁকরু অনুভব করলো স্ত্রী-পুরুষের আহারে ধীরে ধীরে একটা অভাববোধ দেখা দিয়েছে কিন্তু ঘরে দুধ থাকায় এতদিন সে বা তার স্ত্রী শিশু দুটির জন্য উদ্বেগ বোধ করে নি। কিন্তু এখন তার স্ত্রীকে নিঃশব্দে চ'লে যেতে দেখতে দেখতে তার মনে হ'ল রোগা-রোগা দেখাচ্ছে তাকে। দ্বিতীয় সন্তান হবার পরও প্রথমটিকে আদর ক'রে অনেক সময়ে স্তন দিতো তার স্ত্রী। তাতে দুটি শিশুর কারোই অসুবিধা হয় নি। কিন্তু এই পাঁচ ছয় মাসে আহারের স্বাচ্ছন্দ্য কমে গেছে ক্রমশ। এখন কোলের শিশুটির পেট ভরার মতো দুধ দূরের কথা কান্না থামানোর মতো দুধ নেই তার বুকে। কাঁকরুর মন আঁকুপাঁকু ক'রে উঠলো। সে জানে এ সবই হয়েছে তার জমি নেই ব'লে, ওই সড়ক তার জমি গ্রাস করেছে ব'লে। কেউ আসে নি খোঁজ নিতে, ক্ষতিপূরণের কোন আশাই নেই। কিন্তু কি করবে সে, কি করবে ? অনেকক্ষণ ব'সে থেকে থেকে সে আহার্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কিছুদূরে গিয়েই সে আবার ফিরে এলো। খালি হাতে বড়ো জোর নদীর কিনারা থেকে ঢোল কলমির শাক তুলে আনা যায়, কিন্তু শাক খেয়ে কি কোন দিন কারো আদরিণী সুস্থ সবল হয়েছে।

ঘরে ঢুকে সে পাখি শিকারের বাঁটুল নিলো, মাছ ধরার কোঁচ

নিলো। গদাধরের তীর ধ'রে অগ্রসর হ'তে থাকলে কি দু'একটা পাখি চোখে পড়বে না? স্বল্প জলে কলমির জঙ্গলের পাশে শোল জাতীয় মাছও কখন কখন চোখে পড়ে। আমিষ সংগ্রহ করা দরকার। আমিষ ছাড়া স্ত্রীর শীর্ণতা দূর করা যাবে না। হায় রে, এসব কি তাকে কখন এমন ক'রে ভাবতে হয়েছে!

গদাধরের তীর ধ'রে যেতে যেতে সব সময়েই, বিশেষ ক'রে, সকালের দিকে গ্রামবাসীদের কাউকে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো তারা কলমি শাকের ডগা সংগ্রহ করছে, কিংবা কোন গাছতলায় ব'সে নদীতে ছিপ ফেলে কেউ সময় কাটাচ্ছে। এ সবই ছিল শখের ব্যাপার, মেয়েদের শাক সংগ্রহ করা কিংবা পুরুষদের মাছ ধরা। আজ কিন্তু কাকরু অবাক হ'য়ে দেখলো অনেক স্ত্রীলোক একত্রে শাক সংগ্রহ করছে, দু-তিন জন পুরুষ ছোটো ছোটো জাল হাতে জলে নেমে মাছের আশায় জল ঘোলা ক'রে তুলেছে। কাঁকরু প্রথমে ভাবলো এরা সকলেই তার পাড়ার লোক—রাস্তায় যাদের ভাগ্য চাপা পড়েছে। কিন্তু একটু নজর ক'রেই সে বুঝতে পারলো তাদের মধ্যে অন্য পাড়ার লোকরাও আছে। একটা অস্বস্তি মনে নিয়ে কাঁকরু এগিয়ে গেলো। এরকম কেন হ'লো? সে শুধু একা নয়, এ এক বিশ্বজোড়া অভাববোধ।

গদাধরের তীরে ডাহুক থাকে, বুনো হাঁস থাকে, কাঁটা ঝোপে বনমোরগ থাকে কখন। কাঁকরুর চোখে পড়লো না সে সব কিছু আজ। অত্যধিক লোক চলাচলের ফলে তারা পালিয়েছে এ অঞ্চল ছেড়ে। তা ছাড়া অন্যমনস্ক হ'য়ে চলতে চলতে সে কখন কখন শিকারের কথাও ভুলে যাচ্ছিলো।

অবশেষে একজন স্ত্রীলোককে শাকের বোঝা মাথায় নিয়ে একা-একা চলতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো সে, 'এত শাক কয়দিনে খাইবেন?'

'খামো কেনে, বেচিম।'

'বেচবেন ? কোটে, শহরে ?'

শহরেই বিক্রি হবে শাক। বিস্ময় বোধ হয় কাঁকরুব।

যাই হ'ক, সেদিন ভাগ্য ভালো ছিলো তার। ঘাসের জঙ্গলে একটা খরগোস পেয়েছিলো সে। কিন্তু শিকার নিয়ে ফিরে আসতে আসতে সে শহরের লোকদের লোলুপতাব কথাই চিন্তা করতে লাগলো- যে লোলুপতা আকস্মিক ভাবে বেড়ে উঠেছে। আর সে লোলুপতার সঙ্গে অন্তত তার মনে এই কালো সড়কের যেন কোথায় একটা ঐক্য ধরা পড়ছে, যে সড়ক চলমান কোন সত্বার মতো গ্রাস করেছে তার জমি। সব ফুরিয়ে গেলে মানুষও খাবে নাকি তারা ?

বিষয়টা রংববও লক্ষ্য কবেছিলো। তাব স্মৃতিতে তুলনীয় একটা সময়ের চিত্র ছিলো। সেই সেটেলমেণ্টের সময়ে যখন অনেক ভাটিয়া এসে জমিতে লোহার শিকল ফেলে-ফেলে জমিগুলোকে ছোটো ক'রে দিচ্ছিলো, তখনও এক বাব আহার্য সংগ্রহ করার একটা উত্তেজনা গ্রামে দেখা দিয়েছিলো। তখন সংগ্রহকারীদের কেউ-কেউ নামমাত্র মূল্যও পেয়েছিলো তাদেব শ্রমের, কেউ বা পায় নি। এবার সংগ্রহকারীরা দাম পাচ্ছে এবং কখন শ্রমের তুলনায় নগণ্য হ'লেও, সংগ্রহের প্রকৃতিজাত জিনিসগুলো এতদিন মূল্যহীন ছিলো ব'লে সে দামকেই কল্পনাতীত মনে হয়। আর সংগ্রহকারীদের একটা চারিত্রিক প্রবণতাও ধরা পড়ছে রংবরের কাছে—খুচরো পয়সা হাতে পাওয়ার যে মোহ একটা কৌতুকের খেলার মতো সুরু হয়েছিলো, সেটাই যেন এর মধ্যে প্রয়োজনের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হয় তা রংবর বুঝতে পারে নি, কিন্তু অন্য একটি প্রশ্ন উঠেছে তার মনে, এরই ফলে কি সব কিছুর দামই বাড়বে না ? শহরের জন্য কি ধানও দরকার হবে না ? রংবর নিজের জীবনে একটা ভুল করেছিলো : ধানের দাম চড়তে দেখে সে খাওয়ার ধানেরও কিছু বিক্রি ক'রে দিয়েছিলো সেবার। কষ্টও পেয়েছিল যথেষ্ট, যে চড়া দামে ধান বিক্রি

হয়, কিনবার সময়ে চাষীকে তার চাইতেও বেশী দাম দিতে হয়। মুদ্রার প্রচলন হবার পর থেকেই এটা হয়েছে। এবারও যদি ধানের দাম চ'ড়ে যায় তা হ'লে চাষীরা কি খাওয়ার ধানের কথা ভুলে যাবে না ? কিন্তু বাহাত্তুরে বুড়ো সে—একালের কি-ই বা বোঝে।

॥ সাত ॥

সড়ক তৈরি করার নানা স্তর। একদল মাটি কেটে মাটি তুলে রাস্তা উঁচু করছে, তার পিছনের দল পাথর ভাঙছে, তার পিছনের দল পাথর ও পিচের রাস্তা বিছিয়ে দিচ্ছে। এতদিন তারা সড়কের পাশে পাশে ছু'তিন মাইল ধ'রে ছড়িয়ে থাকতো। গদাধরপুরের কাছাকাছি এসে তাদের রীতি বদলে গেলো। ছুখিয়ার কুঠি ছাড়িয়ে তারা গদাধর পার হ'য়ে হ'য়ে শহরে গিয়ে উঠলো, কিন্তু কুচোপাথর ও পিচ ঢালার শেষ দলটি যখন শহরে পৌঁছালো, মাটি কাটার প্রথম দলও তখনও শহর ছাড়ে নি। প্রথমে মনে হ'লো, এবার ওদের নিজেদের মধ্যেই সামনে এগোবার জন্য গুঁতোগুঁতি সুরু হবে, কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। গদাধরের পাড় ধ'রে একটি দল যেমন বসলো, তেমনি আর এক দল ব'সে গেলো নায়েব আহিলকারের কুঠির অনতিদূরে বড়ো মাঠটা জুড়ে; তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ দলও নদী পাব হ'য়ে শহরের ইতস্তত ফাঁকা জায়গা দেখে ব'সে পড়লো। নদীর ছু'ধারে ঝাউ ও কাশ, গ্রামে ও জঙ্গলের সীমায় বাঁশ। অজস্র, এমনকি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংগ্রহ ক'রে তারা আস্তানা বাঁধতে সুরু করলো। প্রায় এক পক্ষ কাল তারা অন্য কোন কাজই করলো না। দেখে শুনে লোকে ভাবলো, এরা কি নিজেদের দেশ ও পরিবার-পরিজনের কথা ভুলে গিয়ে এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছে? তাদের এ ধারণাটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্যই যেন নায়েব আহিলকারের কুঠি থেকে বেরিয়ে

গিয়ে কিছু দূরে শহরের পুরনো পথের ধারে ইটের তৈরী ছোটো-ছোটো চার পাঁচটি বাড়ি উঠছে ওভারসিয়ার এবং তার সহায়ক অন্যান্যদের জন্য। একথাও শোনা যাচ্ছে, একজন ইঞ্জিনীয়ার এসে বাস করবে এই বাড়িগুলোর সব চাইতে সুদৃশ্যটিতে, যখন সময় হবে।

সব অভিযানের মতো সভ্যতার এই অভিযানও সম্মুখে বর্ষা দেখে থেমে পড়েছে। আর বর্ষার আগে যেমন সঞ্চয় প্রয়াস দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই, এ ব্যাপারেও যেন তেমনি সব লক্ষণই দেখা দিলো। গোরু গাড়ি, মোটর-ট্রাকে যেমন আসছে তেমনি আসছে মানুষের কাঁধে মাথায়—ইট-পাথর সিমেণ্ট, লোহা লক্কড়, যন্ত্রপাতি। শ্রমিকদের বস্তির সামনে ইট-পাথরের স্তূপ জমা হচ্ছে। সিমেণ্ট লোহালক্কড় যন্ত্রাদি ওভারসিয়ারদের তাঁবুর কাছাকাছি দু'তিনটে লম্বা লম্বা একচালার নিচে জমে যাচ্ছে।

লোকে ভাবলো নতুন ধরণের সড়ক তৈরি করতে পাথর পিচ লাগে, ওভারসিয়ারদের কোয়ার্টার্সের জন্য না হয় ইট আর সিমেণ্ট লাগবে, কিন্তু লোহার এই বড়ো বড়ো রেল দিয়ে কি হবে? শেষে শোনা গেলো গদাধরের উপরে ব্রিজ তৈরি হবে। সংবাদটা শুনে উত্তেজনা অনুভব করলো শহরের লোকরা। গ্রামের লোকরা বিস্ময়ের কিছু দেখবার জন্য ইতিমধ্যেই নিজেদের গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে গদাধরের বর্ষার আগেকার শীর্ণ ধারার দিকে চেয়ে থাকে।

বস্তির চালা তোলা শেষ হওয়ার পরই শ্রমিকরা কাজে লেগে গেলো। গোরু গাড়ী ক'রে প্রত্যেকটি বস্তির সম্মুখে পাথর ঢালা হয়েছিলো। এখন শ্রমিকরা বড়ো বড়ো পাথরের চাংড়া হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে ছোটো ছোটো করছে, ছোটো করার পর আয়তন অনুসারে সেগুলিকে বাছাই করা হচ্ছে। যেন ধান থেকে চাল তৈরি হচ্ছে এমন আগ্রহ।

নায়েব আহিলকার জানতো সড়কটা গদাধরের ওপারে এসে থেমেছে। সে অনুমান করেছিলো, শহরের মধ্যে দু'তিন মাইল পথ শেষ করার জন্য শ্রমিকরা ধারে কাছে কিছু দিন বাস করবে তারপব এগিয়ে যাবে। যদিও তার মত ছিলো ঃ শ্রমিকদের শহরের মধ্যে বাস না-করাই ভালো। এক বিকেলে এজলাস থেকে ফিরে বাংলোর বারান্দায় ব'সে সে দেখতে পেয়েছিলো নতুন একদল শ্রমিক সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে তার বাংলোর পিছনের দিকের মাঠটায় সে কর্মব্যস্ততার চিহ্ন দেখতে পেলো। তার সন্দেহ হ'লো শ্রমিকরা সেই মাঠেই রাত কাটিয়েছে এবং এখন যেন সেখানে ডেরা তুলবার চেষ্টায় আছে। তার মনে হ'লো বিষয়টা উপেক্ষা কবার মতো নয়। সরকারের খাস জমিতেই তারা ছোটো ছোটো চালাঘর-গুলি তুলছে, কিন্তু তার আগে সরকারের প্রতিভূ হিসাবে তার সঙ্গে একবার কথা বলারও কি দরকার ছিলো না? কি করা উচিত এটা স্থির করতে দু'চায় দিন গেলো নায়েব আহিলকারের। ইতিমধ্যে ওভারসিয়ার একদিন তার সঙ্গে দেখা করেছিলো। এবং বিনয় সহকারে, যদিও নায়েব আহিলকারের মনে হয়েছিলো সে বিনয় কাপট্যপূর্ণ, সে বলেছিলো মহকুমা শাসকের খাস-এক্তিয়ারে বাস করবে তারা এখন কিছুদিন, তার জন্য অনুমতি নিতে এসেছে সে। নায়েব আহিলকার ওভারসিয়ারের বিনয়ের কাপট্যটুকু লক্ষ্য না করার ভাণ করেছিলো। কিন্তু তার মনোবেদনার কারণ ঘটেছে। সে দেখতে পেয়েছিলো ওভারসিয়ার ও তার শ্রমিকরা এসে শহরের পরিধি এবং জনসংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। সময়ে সময়ে মনে হয় শহরটাই লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে আর তার পরিবর্তে একটা শ্রমিকের উপনিবেশ দেখা দিয়েছে। তা হ'লেও তার এ আত্মপ্রসাদ ছিলো, এলাকাটা তার। শাসনক্ষমতা তারই হাতে আছে। কিন্তু ওভারসিয়ারদের ঝকঝকে বাংলোগুলো যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে সেগুলিই যেন তার পুরনো কাঠের

বাংলোর দিকে আঙুল দিয়ে তার পদমর্যাদাকে অসম্ভ্রমের ইঙ্গিত করতে লাগলো। অসহায় বোধ করলো নায়েব আহিলকার। ঠিক দু'টি মাসের মধ্যে এই অদ্ভুত ব্যাপার সব ঘ'টে গেলো। সে কি সদরে লিখবে সম্মান ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে তার শহরে তার কুঠি ও দপ্তরের চাইতে অন্য কোন কুঠি ও দপ্তর বেশী রংদার হওয়া উচিত নয়? নিরুপায় ব্যথায় সে স্থির করলো, তা ক'রে সে সদরের অফিসারদের কাছে নিজেকে হীনই করবে। সে যেন কোন কৃষি-ভিত্তিক সভ্যতার নায়ক ও নেতা; বলবত্তর আর এক সভ্যতার কাছে চূড়ান্তভাবে হার মানতে বাধ্য হবে, এই তার ভাগ্য।

একটা কেন্দ্রীয় গতির চারিদিকে শহরটাই যেন গতিমান হ'য়ে উঠেছে। মানুষ যেন জোরে জোরে কথা বলছে আগের চাইতে, তাড়াতাড়ি চলছে।

আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো, ক্রেতা বিক্রেতায় মিলে দু-চারশ' লোক জমা হ'তো। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে তারা মিলিয়ে যেতো। অন্ধকার গাঢ় হ'লে দেখা যেতো হয়তো দু-একটি মাত্র কুপির আলো জ্বেলে দু'একজন মাত্র দোকানদার ব'সে আছে। অন্য আর একদিনও হাট বসবার নিয়ম ছিলো, কিন্তু অনেকদিনই তা বসতো না।

এখন সপ্তাহে দুদিন তো হাট হচ্ছেই, আর একদিন বসাতে পারলে যেন ভালো হয়। আগে যে গ্রামবাসী তিন চারটি লাউ হাটে এনে বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে থেকে শুধু ক্রেতাদের দাম কমানোর কৌশলগুলো লক্ষ্য করতো, এখন সে হাটে বসতে সময় পায় না—যে কোন দামে শ্রমিকরা তার হাত থেকে লাউগুলো কেড়ে নেয়। যে কাটা কাপড়-চোপড়ের দোকানদার বিরক্ত হ'য়ে থু-থু ফেলতো আর বলতো, এ হাটে আবার মানুষ আসে, সে এখন ভিড়ে বিব্রত হ'য়ে চিন্তা করে পরের হাটে ছেলেকে আনতে হবে সাহায্য

করার জন্য।

গোঁসাইদের ছুটো দোকানের চেহারাই বদলে গেছে। হেরম্বর ছেলেরা সদর থেকে একজন দর্জি আনিয়ে বসিয়েছে তাদের দোকানে। জামা-কুর্তা তৈরি হচ্ছে সেখানে। হাটবার বলে কথা নয়, রোজই তাদের দোকানে শ্রমিকদের ভিড়। গজাননের ব্যবসা অন্য পথ ধরেছে—সাপ্তাহিক চাল-ডাল তেল নুন সে শ্রমিকদের যোগান দেয়। ওভারসিয়ারের হাতের চিঠির বিনিময়ে।

নতুন দোকান উঠেছে একটি। লখাই চক্রবর্তীর দোকান। দোকান ছোট, কিন্তু ভিড় কম নয়। দোকানের সামনে কালো রঙ করা টিনের পাতে চুন দিয়ে লেখা—গাঁজার দোকান। মদ-গাঁজা ও আফিম বিক্রি হয়।

॥ আট ॥

মালতীর মেজদাদা পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে বাড়ি এসেছিলো ; কথা ছিলো পুজোর ছুটির পরে কলেজে ফিরে যাবে। ছুটি ফুরিয়ে গেলেও যাই-যাই ক'রেও তার যাওয়া হয় নি। এ বিষয়ে তাকে অনুপ্রেরিত করার কেউ ছিলো না। সেই একদিনের কলহের পরে এই স্থির হয়েছে যেন—সে তার নিজের খুশি মতোই চলবে। ইতিমধ্যে কয়েকদিন সে দোকানে গিয়ে বসেছিলো। সেখানে আজকাল কাজের চাপ পড়েছে। এতে মালতীর বড়দাদা খুশি হয়েছিলো। কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই হয় বই নিয়ে কিংবা গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে কাটে মেজদাদার। বিকেল হ'তেই সে গদাধরপুরে চ'লে যায়।

ওভারসিয়ারের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো ছোড়দাদার, কিন্তু এখন দেখে বোঝা যায় ওভারসিয়ার ও মেজদাদার মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছে। কোন কোনদিন ওভারসিয়ারকে নিয়ে সে গ্রামে আসে। ওভারসিয়ারের বন্দুক আছে—রিজার্ভ ফরেষ্টের একজন কর্মচারীর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে ; এবং সেই সূত্রে কোন কোনদিন তারা শিকারে যায়। ইতিমধ্যে একদিন একটা হরিণ শিকার করেছিলো তারা। সে রাত্রিতে মৃগমাংসের ভোজ হয়েছিলো মালতীদের বাড়িতে। ফরেষ্টার, মেজদাদা ওভারসিয়ার মালতীদের বৈঠকখানায় অনেক রাত অবধি হাসি এবং গল্পে কাটিয়েছিলো। সেদিন মালতীর মেজদাদা লক্ষ্য করেছিলো ইউরোপীয় সভ্য প্রথায়

খেতে বসবার মতো বাসনপত্র নেই তাদের। এরই ফলে সদরে গিয়ে কাঁচের থালা প্লেট, কাঁটা চামচ ছুরি ইত্যাদি কয়েক প্রস্থ সে কিনে এনেছে। সংসারের সাধারণ হিসাবে এগুলি অপ্রয়োজনের। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সুতরাং পড়েছে মালতীর উপরে। এবং এ-সব বিষয়ে সে মেজদাদাকে উৎসাহ না দিলেও তার রুচিকে সমর্থন করে। পর্সিলেনের প্লেটগুলোর গঠনে যে সুকুমারতা সেটা একটা অজ্ঞাত-নাম প্রতীকের মতো মালতীকে খুশি ক'রে তোলে।

মেজদাদার রুচি মালতীকেও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করছে। স্নো-পাউডার তো বটেই, দু'এক মাস থেকে দাঁতের দিশি গার্হস্থ্য মাজনের পরিবর্তে টুথ ব্রাস ও পেষ্ট ধরেছে সে। আয়নায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে দাঁতগুলোতে আগেকার তুলনায় অনেক ঔজ্জ্বল্য এসেছে। খোঁপা বাঁধবার কায়দায় নতুন ধরণ দেখা দিচ্ছে।

এর আগের এক ভোজসভায় পরিবেশন করতে হয়েছিলো মালতীকে। ওভারসিয়ার হেসে বলেছিলো অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে: আপনিও আমাদের সঙ্গেই বসুন না। অসভ্যতা না দেখিয়ে যতদূর সম্ভব তেমনি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলো মালতী। পরে অবশ্য মেজদাদা হাসিমুখে বলেছিলো: তুই পালিয়ে এলি কেন? সব সভ্য সমাজেই আজকাল মেয়েরা পুরুষদের পাশে ব'সেই খায়। বিয়ের পরে কি করতে হবে তোকে কে জানে।

মালতী বলেছিলো: তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ, মেজদা।

ইতিমধ্যে মালতী মেজদাদার আনা কয়েকখানা আধুনিক উপন্যাস পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাম মেজদাদার মুখে সে দু-একবার এর আগেও শুনেছে। কিন্তু যে কবি গান লেখে সে এমন গল্পও লিখতে পারে নাকি। অদ্ভুত! অদ্ভুত! কি যেন সেই মেয়েটির নাম? লাবণ্য। অমন ক'রে কথা বলে যারা তারাও তো তার মতোই মানুষ। মালতী দু-একবার তেমনি ক'রে দু'একটি বাক্য

মনে-মনে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

মালতীর মেজদাদা সিল্কের পায়জামা ব্যবহার করে। একবার সে এক বন্ধুকে কোলকাতা থেকে তেমনি পায়জামা কিনে আনতে বলেছিলো। বন্ধুর পছন্দে কেনা জিনিষ সে ব্যবহার করতে পারে নি অত্যধিক চাকচিক্যের জন্য। প্যাকেট-শুদ্ধ মালতীকে দিয়ে বলেছিলো: কেটে কুটে নিজের জামা বানিয়ে নিস। হাতে কাজ ছিলো না মালতীর এক সন্ধ্যায়। কাঁচিটাকে দেখে তার মনে পড়লো সেলাই করার কথা। রাত্রিতে বই পড়তে ভালো লাগে না, কারণ লম্বা দুপুরটা সে আজকাল বই পড়েই কাটায়। সন্ধ্যা বেলায় আলমারি থেকে সে কাগজে মোড়া পায়জামাটা বার করেছিলো কাঁচি চালানোর জন্য, কিন্তু বড়দাদার ছোট ছেলেটার কান্না থামানোর জন্য বার দুই উঠে যেতে হয়েছিলো। রাত্রিতে আহারাদির পর নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তার আবার মনে হলো জামা বানানোর কথা। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটিয়ে দিলো সে। প্যাকেটের উপরে দোকানদার বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শ্ল্যাকস পরা একটি মহিলার ছবি ছাপিয়ে দিয়েছে। হয়তো আধুনিক সভ্যতার একটা তাগিদের মতো কিছু মালতীর মনে কাজ করেছিলো। হয়তো উপন্যাসে পড়া কোন নায়িকার পোষাক ও পরিবেশের কথা মনে হয়েছিলো তার। পায়জামাটা কাটবার আগে সে সেটা পরলো। কিন্তু আয়নায় নিজের ছবি সে কিছুতেই দেখতে পারলো না সোজাসুজি চেয়ে।

গানের ব্যাপার অন্যরকম। মেজদাদা অনেক সন্ধ্যায় একা বৈঠকখানার বারান্দায় ম্লান তারার অন্ধকারে চুপ করে ব'সে ব'সে কাটায় কিছুদিন থেকে। মালতী সন্ধ্যার পর বৈঠকখানার বারান্দায় আর যায় না, কারণ সেখানে হয় ফরেষ্টার নয় ওভারসিয়ার, কিংবা আজকাল দুজনেই আসছে। দুপুরের কথা স্বতন্ত্র। চুল শুকানোর সময়টা সে বই হাতে কখনো কখনো বৈঠকখানার বারান্দায় গিয়ে

বসে। কিন্তু এক সন্ধ্যায় মেজদাদাকে খুঁজতে গিয়ে সে বৈঠকখানা পর্যন্ত এগিয়েছিলো কারণ সেদিন মেজদাদা বেরোয় নি, তা সে শুনেছিলো। সে যখন বৈঠকখানা থেকে ফিরে আসছে কাউকে দেখতে না পেয়ে, মেজদাদা কথা ব'লে উঠেছিলো।

'কে মালতী ?'

'হ্যাঁ! তোমাকে দেখতেই পাই নি। আলো আনব ?'

'না থাক। তুই বরং ব'স এখানে।'

মালতী বেলিংএ ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো মেজদাদার পাশে গিয়ে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেলো। অবাক-করা অভিজ্ঞতা। সে নিস্তব্ধতায় মালতীর মনে হলো লেখা-পড়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় নিয়েই হয়তো মেজদাদার মন এত খাবাপ !

সে বলল, 'গ্রামোফোন বাজাবে মেজদা ?'

'সব গান তো পুরনো হ'য়ে গেছে। তাব চাইতে তুই একটা গান কর শুনি।'

মালতী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। জীবনে সে গান করে নি। সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরে এই দুখিয়ার কুঠিতে এমন সমাজ ছিলো না যে উচিত অনুচিতের অলিখিত বিধান দিয়ে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত কববে। কিন্তু সভ্য সমাজেব প্রতিভূ হিসাবে অধিষ্ঠান করছিলো গোঁসাইরা, সুতরাং তাদের পরিবাবে এই নিয়মই বাঁধা ছিল যে ভদ্রবংশের মেয়েরা গান-বাজনা করে না, নাটক নভেল পড়ে না। এতদিন পর্যন্ত মালতীও এ নিয়ম মেনে চলেছে। ইদানীং মেজদার আনা বইগুলি পেয়ে এবং তার উৎসাহেই রাত্রিতে কিম্বা দুপুরে বন্ধ দরজার পিছনে সেগুলি প'ড়ে মালতী যা করছে তাকে বিপ্লব না বললেও, নতুন পথে যাত্রা বলতেই হবে। খানিকটা যেন অন্য জগতে স'রে এসেছে মালতী তার পুরনো জীবন থেকে এবং সে খবর কেউ-ই জানতো না।

কিন্তু মালতীকে থামতে হ'লো। তার হাসিতে মেজদাদার স্তব্ধতা দূর হয় নি বরং তার হাসিটাই যেন অকালোচিত প্রতিপন্ন হয়েছে।

গ্রামোফোন শুনতে ব'সে মনে মনে এর আগে গান করে নি সে কোন দিন, তা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু সে কি কখন গলায় ফুটোনো যায়। তবু এর পরে আর এক সন্ধ্যায় মালতী মেজদাদার অনুরোধে গুনগুন ক'রে গান গেয়েছিলো। চড়া পুরুষালি গলা; শিক্ষার কিছুমাত্র সুযোগ হয় নি, অন্যের কানে খুব সম্ভব বেসুরো শুনাতো সে গান। মেজদাদা কিন্তু তারিফ করেছিলো।

মালতীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় সে কিন্তু বলবে তার গানের চাইতেও অনেক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেজদাদার জীবনের ভঙ্গি, সেটা যেন দিনকে দিন একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে। সেটার সঙ্গে তার বড়দাদা কিংবা ছোড়দাদার বাস্তব জ্ঞানের উপরে গড়ে-ওঠা জীবন-পদ্ধতির খুব বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা দিচ্ছে কোথাও কোথাও।

মেজদাদা বাড়িতে আসবার পর থেকেই এমনি ক'রে ভাই-বোন পরস্পরের কাছাকাছি যাচ্ছিলো বাড়ির অন্য সকলের তুলনায়। প্রতি সন্ধ্যায় তারা একত্র বসে না। কারণ অনেক দিনই ওভার-সিয়াররা এসে পড়ে। বাইরে পুরুষদের হাসি গল্প চলতে থাকে। মালতী হয় সুপুরি কুচোয়, কিংবা কাঁথার ফুল তোলে। কিন্তু যে দিন ওভারসিয়াররা আসে না, মেজদাদা তাকে বাইরে ডেকে নেয়, তার পাশে ব'সে গুনগুন ক'রে রেকর্ডে শোনা গান করে মালতী। এবং দু'একদিন ওভারসিয়াররা এলেও ছোড়দার উপরে অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে মেজদাদা পালিয়ে এসে বসে মালতীর ঘরে। এরকম দু-একটি দুর্লভ সন্ধ্যায় আলাপটা সাহিত্য পর্যন্তও এগোতে চেষ্টা করে। যদিচ বইটা ভালো কিংবা কঠিন কিংবা মিষ্টি এর

চাইতে অগ্রসর কোন মতামত দিতে পারে না মালতী।

একদিন মা তাদের আলাপ শুনে বলেছিলেন, 'বোনকে কি হাকিমের ঘরে বিয়ে দিবি ?'

'তা কি কেউ বলতে পারে কোথায় হবে ? শহরের কোন ধনীব ঘরেও তো যেতে পারে।'

'সে তোরাই বুঝবি, আমি আর কি বলব।'

বউদি বলতে মালতীর একজনই, তার বড়দাদার স্ত্রী। সে রসিকতা ক'রে বলেছিলো, 'ঠাকুরঝি নিজেই হাকিম হ'তে পারে।'

পিছন ফিরে মালতী দেখতে পায় গত চার পাঁচ মাসে সে যেন সত্যই একটা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে গেছে।

একদিন মালতীর একটা কষ্টের কারণ ঘটে গেলো। দু-তিনদিন ক্রমাগত অহর্নিশি বৃষ্টি চলবার পর দুপুরের মাঝামাঝি এসে সেটা থেমেছে। বর্ষাকালের এই রূপ এখানে। দু-তিনদিন থেমে থেমে জল হয়, বাদলা বাদলা বাতাস চলে, তারপর চার পাঁচ দিন ধ'রে ক্রমাগত ধারাবর্ষণ হ'তে থাকে। আজ বৃষ্টি ধরেছে বটে, আকাশ অত্যন্ত নিচু হ'য়ে আছে, তার রঙও কালচে। জল নামলেই হলো।

এ বর্ষায় কেউ বাড়ি থেকেই বার হ'তে চায় না, গদাধরপুর থেকে ওভারসিয়ারের বেড়াতে আসা দূরের কথা। মালতীর বড়দাদা এবং ছোড়দাদা আড়ত থেকে আজও হয়তো বাড়িতে আসবে না। মালতী বৈঠকখানায় গিয়েছিলো। খানিকটা সময় বর্ষামেদুর আকাশের তলে সজীব সচল প্রকৃতির দিকে চেয়ে থেকে তার মেজদাদার কথা মনে পড়লো। বৈঠকখানার বারান্দা থেকেই মেজদাদার ঘরের ভিতরটা

দেখা যায়। জানলা খোলা ছিলো। মালতী দেখতে পেলো একটা ডেক চেয়ারে মেজদাদা শুয়ে আছে। তার দুটো হাত মুঠো করা, মুখটা বিবর্ণ। মালতী তাকে ডাকতে যাচ্ছিলো, এস মেজদাদা বাইরে বসি। কিন্তু তার মুখে অপরিসীম ক্লিষ্টতার ছাপ দেখে সে তাড়াতাড়ি মেজদাদার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

'কি হয়েছে, মেজদা ?'

মেজদাদা হাসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কথা বললো না। মালতীকে অবাক ক'রে ঘরময় পায়চারি ক'রে এলো।

'না, মেজদা বলো, কি হয়েছে তোমার ?'

তার অনুভব হ'লো কি এক দুরন্ত অভিমান মেজদাদার হয়েছে যার জন্যে অসুস্থতার কথাও বাড়ির কাউকে বলতে চায় না।

সেদিনের সন্ধ্যা-রাত্রি একটা অখণ্ড উৎকণ্ঠার মতো। বাড়ির আর কাউকে না-জানালেও রাত্রিতে দু-একবার মালতী উঠে এসে মেজদাদার ঘরের বন্ধ দরজায় কান পেতে বুঝবার চেষ্টা করেছে মেজদাদার ঘুম হচ্ছে কিনা। মেজদাদা ঘুমুতে পারছে না এটা বুঝতে পেরেছিলো সে। ভোরবেলা সে মেজদাদার দরজায় মৃদু করাঘাত ক'রে ডাকলো। এক রাত্রিতে মেজদাদা যেন বুড়ো হ'য়ে গেছে। দরজা খুলে দিয়ে সে হাসলো বটে কিন্তু তার কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে কি একটা দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে—হাসিটাকে এ-সবের পাশে নিতান্ত দীন ব'লেই মনে হ'লো।

সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে বিকেল। মালতী অনেক অনুরোধ ক'রে মেজদাদাকে স্নান করিয়েছে। মায়ের সাহায্য নিয়ে মেজদাদাকে কিছু খাইয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মেজদাদা তার উত্তরে বলেছিলো: এই তো কমে গেছে।

দিনটা অনেকটা শান্ত ভাবেই কেটে গেলো। কিন্তু বিকেলের পর

থেকে, মালতী লক্ষ্য করলো, মেজদাদা কেমন অস্থির হয়ে উঠছে আবার। বাইরেও আকাশ-বাতাস দুর্যোগের লক্ষণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

মালতী বললো, 'মেজদা, ডাক্তারকে ডাকাই।'

'কে ডাক্তার? গদাধরপুরের কম্পাউণ্ডার ওষুধের দোকান দিয়েছে, সেই?'

'হ্যাঁ। সে তো চিকিৎসা করে।'

'আমার এ অসুখের কোন ডাক্তারি নেই, ভাই। সদবেও দেখিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অসুখেব হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পাই।'

হেঁয়ালির মতো বোধ হ'লো মেজদার কথা, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে আবার।

'মেজদাদা, সদর থেকে ডাক্তার আনানো হ'ক তা হ'লে।'

মেজদাদা জানালার গরাদে চেপে ধ'রে দাঁড়িয়েছিলো, ফিরে এসে মালতীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর বললো: 'আমি কাউকে জানাতে চাই না। তুই কি গোপনে ব্যবস্থা করতে পারিস?'

মালতী যেন চাঁদ হাতে পেলো।

'পারি। ছোড়দাদা বাড়িতে এসেছে কিছুক্ষণ আগে।'

'না। তুই থাম! এমন ক'রে লোভ দেখাস নে।'

মালতী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে খানিকটা ভাবলো।

'আমি পারি মেজদাদা গোপনে সব ব্যবস্থা করতে, কি করতে হবে বলো। কোথায় ওষুধ পাওয়া যাবে?'

'সদরে যেতে হবে না। গদাধরপুরে আমাদের বন্ধু ওভারসিয়ারের কাছে গেলেই পাওয়া যেতে পারে। সে জানে আমার অসুখের কথা।'

মালতী উঠে দাঁড়ালো।

'কোথায় যাচ্ছিস? ব'স। তোর ছোড়দার কাছে শুনেছিস তো পথ ঘাট কেমন কষ্টের। তা ছাড়া এখনই জল নামবে ব'লে মনে হচ্ছে।'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি দেখছি।'

'আমি কি এত অমানুষ রে?'

মালতী ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

নিজের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে মালতী চিন্তা করলো। তারপর আয়নার সামনে গিয়ে অগোছালো চুলগুলোতে চিরুনি দিলো, শাড়িটা পাল্টালো। আলনা থেকে মাতালুব উপহার দেওয়া ফুলদার চাদরটা গায়ে জড়ালো; দরজা খুলে বেরুনোর আগে টেবিলের কাছে ফিরে এসে সরু ক'রে কাজল দিলো চোখে।

একদিন এক বিপদে ছোড়দাদাকে ডাকবার জন্য মাতালুকে পাঠিয়েছিলো মালতী ওভারসিয়ারের কাছে। আজকের এই বিপদেও মাতালুর কথাই মনে হয়েছে তার।

মাতালু তার ঘরে ছিলো।

ধনী ঘরের আদুরে ছেলে সে, অন্যান্য কৃষকরা তখনও জমি থেকে ফেরে নি, রোপা ধান লাগাচ্ছে তারা। মাতালু আজ দুপুর থেকে ঘরে ব'সে দোতারাটাকে তার পরাচ্ছে। সে ভাবছিলো গুড়ালবাঁশ (বাঁটুল) চালানোটা কাঁকরু তার কাছে শিখেছে, কিন্তু সে কাঁকরুর কাছে দোতারা বাজানোটা শিখতে পারলো না। কাঁকরু যে কোন সুর একবার শুনলেই দোতারায় তুলে নিতে পারে। কিন্তু কি যে হবে কাঁকরুর। সে কি আর দোতারা বাজাবে?

এমন সময়ে মালতী এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

'মাতালু, একবার গদাধরপুরে যেতে পারবে ?'

'তোমরা পাগল হইছ ? এক হাঁটু কাদা রে পাকা রাস্তা যেটে শেষ হইছে।'

'আমার অবস্থা পাগল হওয়ার মতোই।'

'কেনে রে ?' মাতালু উঠে দাঁড়িয়ে মালতীর কাছে গেলো।

'গদাধরপুর থেকে একটা ওষুধ এনে দিতে হবে।'

'কার ঔষুধ ?'

'মনে করোনা আমার জন্যেই।'

মাতালু মালতীর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিলো।

'ওভারসিয়ারকে চেনো তো, তার কাছেই ওষুধ আছে।'

'ওভারসিয়ার ? তাব টে তোমার ঔষুধ !'

মালতীর মনে হ'লো সে চালে ভুল করেছে। সুবেশ যুবক ওভারসিয়ার তাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করে এ সংবাদ মাতালুর অজ্ঞাত নয়। স্বভাবতই একটা ঈর্ষা, তা সেটা যতই অকারণের হ'ক, মাতালুকে পেয়ে বসতে পাবে।

মালতী বললো, 'মেজদার অসুখ করেছে।'

'হেঁ ?'

'যাবে ?'

'মুই ওবরসিয়ারের টে না যাও।'

মালতী কানাঘুষোয় এও শুনেছে যে কাঁককদেব জমি বেদখল করা নিয়ে ওভারসিয়ারের উপরে এ গ্রামের সব কৃষকেরই একটা ক্রোধ আছে।

মালতী মাতালুর কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখলো। আর সেই হাতের নিচে মাতালুর হৃদয়েব কাঠিন্যগুলি গ'লে যেতে সুরু করলো। মাতালু লক্ষ্য করলো মালতীর চোখের কাজলের রেখা, সে দেখতে পেলো মালতীর দেহ-বেষ্টন ক'রে তার উপহার-দেয়া চাদর।

মাতালু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

'যাবে, মাতালু ?'

মাতালু মালতীর হাতখানা নিজের কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে নিজের দু'হাতে নিলো।

'যাও রে।' মাতালুর গলা মিশ্র আবেগে ধ'রে এলো।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর মাতালুর পা দু'খানা যেন বিদ্রোহ করতে লাগলো। কাঁকরুদের বাড়ির পাশ দিয়েই সোজা পথ। সে পথে না গিয়ে সে ঘোরাপথ ধরলো। কিন্তু আকাশের মেঘ, পায়ের তলায় কাদায় ডোবা পথ, পথের পাশের কোন গাছের ভিজে পল্লবের স্পর্শ, এ সবই যেন তার অনুভূতির বাইরে প'ড়ে রইলো। মনের মধ্যে একটা দুঃসহ অবস্থা, যার হদিস সবটুকু করতে পারছেনা সে। দ্বন্দ্বের মতো ভিন্নমুখী কয়েকটি আর্কষণে যেন তার অন্তরটা ছিঁড়ে যাবে। কেউ কি তাকে দেখেছে, দেখতে পাচ্ছে ? এই ভাবতে ভাবতে সে প্রকাশ্য পথ ছেড়ে ক্রমাগত ঘোরাপথে চলতে লাগলো।

ওভারসিয়ারের নতুন বাংলোর সামনে সে যখন পৌঁছালো তখন সে যেন অতিরিক্ত জোরে হেঁটে আসার ফলেই হাঁপাচ্ছে।

ঔষুধ, মালতীর মেজদাদার অসুখ প্রভৃতি দু-একটি কথা বলতেই বাকিটুকু ওভারসিয়ার বুঝতে পারলো।

ফিরবার পথে মাতালু যেন ক্লান্তির শেষে পৌঁছে গেলো। সর্বস্বান্ত হ'লে মানুষ যেমন দিগন্তে বিশ্রামের কোন একটু বিন্দুর দিকে চাইতে চেষ্টা করে, মাতালুর মনে তেমনি থেকে থেকে মালতীর চোখ দু'টি ফুটে উঠতে লাগলো। সে বুঝতেই পারলো না কেন পথ চলতে তার মতো পুরুষের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মেজদাদার অসুস্থতা সেবারের মতো সেরে গেলো। ওভার-সিয়ার আবার আসছে। বারান্দায় ব'সে মেজদাদা সুস্থ সুন্দর গলায় হেসে ওঠে। মালতী একদিন লক্ষ্য করলো অসুখের সময় যেমন

করেছিলো মেজদাদা, তেমনি ইনজেকশন নিচ্ছে মেজদাদা নিজে-নিজেই। আর শুধু সেই নয় ওভারসিয়ারও। জামার আস্তিন গুটিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দিলো মেজদাদাব সামনে, আর মেজদাদা সূচ ফুঁড়িয়ে দিলো ওষুধেব।

মালতী বললো সেদিন, 'মেজদা, অসুখ তোমাব সারে নি বলো।'

'কে বললে তোকে ?' ব'লে মেজদাদা পাশ কাটিয়ে গেলো।

মালতী এটা আজ বিশেষভাবে লক্ষ্য কবলো। মেজদাদা কিছুদিন থেকে যেন পাশ কাটিয়ে বেড়ায়। ওভারসিয়াব না এলেও মালতীব ঘরে গিয়ে সে বসে না। কারো সঙ্গেই সে কথা বলতে চায় না।

॥ নয় ॥

কাঁকরু বললো একদিন, 'রাগ করছিস, ধনী ?'

'কেনে ?'

'আইসঙ নাই মুই বহুৎ দিন।'

দোষটা কাঁকরুর একার নয়। মাতালুও তাকে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেই ওষুধ আনার ঘটনার পর থেকে। নতুবা দেখা হ'তো।

কাঁকরু যে খবরটা দিতে এসেছিলো সেটা তার বাধছে। সে মাতালুর মুখের থেকে চোখ সরিয়ে এনে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো।

মাতালু বললো, 'কাঁকরু রে, দোতারা আনিম, বা ?'

কাঁকরু দোতারা বাজায় ভালো, ভালোও বাসে বাজাতে। আর যদি মন ভালো থাকে বাজাতে বাজাতেই গান গেয়ে ওঠে। দুঃখ ব'লে কোন বিষয় ধারে কাছে থাকতে পারে না।

কাঁকরু নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে নিষেধ করলো।

অবশেষে ইতিউতি ক'রে আকাশ ও মাটির দিকে খানিকটা মনোযোগ দিয়ে কাঁকরু মাতালুর মুখের দিকে না-চেয়ে বললো, 'নোকরি নিছঙ।'

'নোকরি ?' মাতালু পরিহাসের সাহায্যে লঘুতা আনার চেষ্টা করলো, 'সাহেব হইবেন, বাহে ? তোমরা দেখি বড়মানুষ হইবেন।'

কিন্তু রসিকতাটা জমলো না।

মাতালু লক্ষ্য করলো কাঁকরুর মুখের যে পাশটা তার দিকে

ফেরানো তাতে পেশীগুলি কাঁপছে। চাকরি-নোকরি মাত্রই ভাটিয়ার হাতে। এবং খবরটা কাঁকরু হয়তো আনন্দ ক'রে দিতে আসে নি। বন্ধুকে ব'লে অনুশোচনাটাই জানাতে চায়। তার মনে হলো চাকরিটা হয়তো ওভারসিয়ারের কাছেই পেয়েছে সে।

সান্ত্বনা দেয়ার সুরে মাতালু বললো, 'কি করা তা। মান্সির তো বাঁচি থাকা লাইগবে।' কাঁকরু ভাবতে লাগলো।

কিন্তু বিস্মিতি হলো মাতালু নিজের মনের গতিবিধি দেখে। সে অকস্মাৎ যেন সুখী হ'লো কাঁকরুর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে। চাকরি পেয়েছে বন্ধু, তার জীবিকার একটা উপায় হ'লো এসব তার এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ নয়। সে নিজের পরাজয় বোধ করতে পারে নি। এখন কাঁকরুও পরাজিত হয়েছে এটাই যেন তার মূলে আছে—কিন্তু এ মনোভাবটা মুহূর্তের এক স্বল্পাংশ ধ'রেই প্রাধান্য পেলো।

পরক্ষণেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে মাতালু বললো, 'কি নোকরি পাইছিস, কাঁকরু? কত করি তনখা। ইয়াতে তোর দিন যাইবে?'

কাঁকরু থু-থু ফেলে বললো, 'তুই কুড়ি দিবে।'

'তা কর নোকরি। হইবে কোন রকম।'

কাঁকরুর চাকরিটা সুরু হয়েছে দু-তিন দিন হলো। কিন্তু হাতে ক'রে কোন কাজই তাকে করতে হয় নি। যে লোকটি তাকে কাজ দিয়েছে তার পোশাক পরিচ্ছদ হাব ভাব পুলিশের বড়ো দারোগার মতো। সে ব'লে দিয়েছিলো,—ডাকব কাজের দরকার হ'লেই। আজ থেকে তুমি বহাল হ'লে, বেতন পাবে। কিন্তু দু'দিন চ'লে গেলেও যখন কাজের জন্য ডাকতে এলো না কেউ, কাঁকরু ভেবেছিলো—ভাটিয়াদের অন্য অনেক ব্যাপারের মধ্যে এটাতেও ফাঁকি নেই তো? আজ সে গিয়েছিলো যাচাই করতে চাকরিটা স্বপ্ন কি না। সেই নতুন

দারোগা তার কথা শুনে অনেক হাসলো। তারপর বলেছে : তিন দিনে তোমার প্রায় চার টাকা হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। তবে এ চাকরির কথা কাউকেই বলবে না বন্ধু-বান্ধব দু-একজন ছাড়া।

কাঁকরুর মনের এ এক অদ্ভুত অবস্থা। ব্যাপারটা ভাটিয়াদের ফাঁকি হ'লেই যেন ভালো ছিলো। চাকরিটা যত নিকটবর্তী এবং বাস্তব হ'য়ে উঠছিলো তত তার অস্বস্তি বাড়ছিলো। চাকরিটা না হলেই যেন যে অভাববোধটা একটা অনতিক্রম্য যুক্তির মতো চাকরির দিকে টানছে, তাকে বলতে পারতো—তোমার কথা শুনে এগিয়েছিলাম—হ'লো না চাকরি, কি করবো বলো।

এখন হয়েছে কি, সরকারের একটা আবগারী বিভাগ আছে, আইনগত ভাবে রাজ্যের সর্বত্রই তার শাসনাধিকার। কিন্তু এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত তার প্রভাব এসে পৌঁছায় নি। রাস্তাটা তৈরি হয়েছে ব'লেই যেন সেই পাকা সড়ক ধ'রে তারা এগিয়ে এসেছে। অনেক কাজ তাদের। প্রকাশ্য কাজগুলো কিছু সুরু হয়েছে ইতিমধ্যে—এ অঞ্চলে প্রায় সব গৃহস্থের বাড়িতেই অনেক সুপারি গাছ আছে। গাছগুলোর গায়ে জড়িয়ে উঠেছে দিশি পানের লতা। কার বাড়িতে কত সুপারি গাছ আছে তার হিসাব নেয়া হচ্ছে। আর গদাধরপুরে একটা দোকান বসেছে মদ-গাঁজা-আফিমের।

কিন্তু অপ্রকাশ্য কাজও কম নয়—এ অঞ্চলের কোন কোন বাড়িতে দিশি প্রথায় মদ চোলাই হয়। সাধারণত বয়স্কদের মধ্যেই মদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো সেটা সর্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নয়। প্রৌঢ়ত্বে পার হ'তে হ'তে স্ত্রী কিংবা পুরুষ যখন নিজের রক্তের উষ্ণতা কমে যাচ্ছে ব'লে অনুভব করে তখন তাদের কেউ-কেউ বলাধানের জন্য কিছু কিছু মদ চোলাই করে। এ কাজটিকে বিধিবদ্ধ প্রথায় তুলে দেয়া দরকার।

কিন্তু প্রধান অপ্রকাশ্য কাজ হচ্ছে একটা আন্তর্প্রাদেশিক চোরা-

কারবারের মূলোচ্ছেদ করা। বহুদিন থেকেই এ সংবাদ পাওয়া গেছে গদাধরপুর এবং তার আশেপাশের গ্রাম্যপথ দিয়ে শতাধিক মন আফিম আসামে চালান যাচ্ছে গোপনে। জেনে শুনেও এতদিন কিছু করতে পারে নি রাজ্য সরকার—কারণ আফিম চালান যাওয়া না-যাওয়ার উপরে রাজ্যের উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। কিন্তু নতুন মন্ত্রী এসে বলেছে শত শত মন আফিমের উপরে ট্যাক্স-ডিউটি বসাতে পারলে সহস্র সহস্র টাকা আসবে রাজকোষে। আফিমের এই চোরাকারবার ধরার জন্য জাল তৈরি হচ্ছে, তার জন্যই কাঁকরুর চাকরি। তাকে এসব এখনও কিছু বলা হয় নি। আবগারী দারোগা স্থির করেছে শুধু ভাটিয়া কর্মচারী দিয়ে চোরাচালানের কিনারা করা সম্ভব নয়। আদিবাসীদের সঙ্গে সন্দেহ উদ্রেক না ক'রে মিশতে পারে এমন একজন লোকের খোঁজ করতে গিয়েই কাঁকরুর উপরে চোখ পড়েছে তার।

কাঁকরু অনুভব করলো—কি উপায় আছে আর? রাস্তার উপরে ওদের যে ষ্টিম-রোলার চলে সেটা যেমন সব বাধাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে যায়, তেমনি নির্মম ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে ভাটিয়ার স্রোত গদাধরপুরের দিকে। দুখিয়ার কুঠির উপর দিয়েই সে স্রোত বয়ে যাবে।

মাতালু ষ্টিম-রোলারের চাইতেও বেশি কিছু দেখেছিলো। আকাশে উড়ে আসে হাওয়াই জাহাজ। কি তার গর্জন, কি তার ক্রোধ। ওভারসিয়ারকেও হাত জোড় ক'রে দাঁড়াতে হয়। মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে গেলো তার।

কাঁকরু আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে অবশেষে বললো' 'কাউক কইস না!'

ব'লে বেড়ানোর মতো কথা নয় তা মাতালু অনুভব করেছে। প্রায় সকলেই হার মানছে। স্বকীয়তাকে রক্ষা করার সহজ প্রবৃত্তিটা

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে কান্নাকাটি চেঁচামিচি করে, একের পরাজয়ে অন্যে হয়তো বা সমবেদনা অনুভব করে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, অন্তত কথা দিয়ে তা নির্দিষ্ট হয় না।

ঘটনাগুলি বলবার দরকার নেই' সেগুলি সকলের চোখের সম্মুখেই ঘটছে। আলোচনায় সুতরাং ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করবে না কেউ। প্রশ্নটি উত্থাপন করে।

মাতালু একদিন রংবরকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'কি হবে আজা ?'

কোন নির্দিষ্ট সমস্যা নয় ; কাঁকরু, মাতালু এবং তাদের মতো অন্য অনেকের সমস্যা মিলে মিলে একটা সাবিক সমস্যা রংবরের মনের কাছে সমাধান চাইছে। কিন্তু কি বলবে সে ?

রংবর জানে জীবনে অনেক সময়ে অনেক জটিলতা এসে উপস্থিত হয়। বহু বুদ্ধিমান সমবেত চেষ্টা ক'রেও সে গ্রন্থি মোচন করতে পারে না। কিন্তু একটা পথ রংবর নিজে খুঁজে পেয়েছে। গ্রন্থি-মোচন নিজে থেকে হবে এই আশা নিয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করা যায়। জীবনে যতই জটিল আর্বত দেখা দিক, তার একটা সরল সম্মুখ বেগও আছে। সে প্রবাহে আবর্তকে মুছে দিয়ে কখন আবর্তকে অন্তর্লীন ক'রে জীবন ছুটে চলেছে। তার নিজের জীবন থেকেও সে এমন দু'একটা জটিলতা উল্লেখ করতে পাবে। আর সে জটিলতার মধ্যে এমন বিষয়ও আছে যা অন্তরের অন্তস্থলে দগ্ধক্ষতের সৃষ্টি করে।

সেই মহামারীর পর দুখিয়ার কুঠিতে যে কয়েকজন ফিরতে পেরে-ছিলো তাদের মধ্যে ছিল রংবর, রংবরের মামা আর তার মেয়ে ফুলমতী। রংবর ও ফুলমতী প্রায় সমবয়সী। তখন তাদের বয়স বছর দশেক। এর প্রায় বছর পাঁচ সাত পরে রংবর ও ফুলমতীকে বিয়ে দিয়ে তাদের সংসার সাজিয়ে দিয়ে রংবরের মামা ইহলোক ত্যাগ করে। তখনকার দিনে একটা বাৎসরিক বিপদ ছিলো। মহামারীর আতঙ্কে প্রদেশপালের চৌকি উঠে গিয়েছিলো, কিন্তু দু'তিন বছর কেটে

যেতেই খাজনা আদায়ের জন্য তহসিলদার আসতে শুরু করেছিলো। সে একা আসতো না। তার তহসিলদারি বরং যেন লুটপাটের মত্নো. ছিলো। খাজনাটা নগদ টাকায় আদায় কমই হ'তো, সুতরাং ধান ও তামাক সংগ্রহ করতো এবং তা করতে গিয়ে কৃষকদের উপর তম্বি ক'রে যার কাছে যা সম্ভব তা নেয়া হ'তো। তহসিলদারির মধ্যে পড়ে না এমন সংগ্রহের দিকে তাদের নজর ছিলো। পুরুষ আর সবই সহ্য করতে পারে, অনেক পরাজয়ও স্বীকার করতে হয় জীবনে, কিন্তু নারীকে অন্য কারো হাতে তুলে দেওয়া যায় না। ক্রোধে প্রতিবিধিৎসার ইচ্ছায় গ্রামের পুরুষরা অস্থির হ'য়ে উঠতো। কিন্তু সশস্ত্র দুর্ধর্ষ ভোটরা যাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে নি, কি করতে পারে মুষ্টিমেয় কৃষক তাদের বিপক্ষে? তখন সড়ক তৈরি হয় নি। এক বুক ঘাস ছিলো নদীর তীরের সব জমিতে। ঘোড়সওয়ারদের চলার ধাক্কায় সে সব ঘাস নুয়ে পড়তো, তারা চলে গেলেই ঘাসগুলো আবার মাথা তুলতো। এ থেকেই যেন কৃষকরা কর্তব্য শিখে নিলো। খাজনার পরিমাণ ধান ঘরে রেখে, বউ ছেলেমেয়ে ও গাইবলদ নিয়ে কৃষকরা বনে পালিয়ে যেতো। দিন সাতেক বাদে ফিরে এসে তচনচ করা ঘরে আবার এক বছরের জন্য ঘর বাঁধতো তারা। বড়ো কোন নদীর তীরে যাদের বাস কালবৈশাখীর ব্যাপারে তাদেরও এরকম করতে হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও দেখা যেতো। অত বড় বিরাট অরণ্যে যে-ক্ষেত্রে নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া যায়, গ্রামের কোন কোন মেয়ে ভাসাভাসা হাল্কা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করতো, কিংবা বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতো। তারা ধরা পড়তো ঘোড়সওয়ারদের হাতে। এই ধরা পড়াব ব্যাপারে গ্রামের কতগুলি মেয়ে যেন অভ্যস্থ হ'য়ে পড়ছিলো। অবশ্য সৈনিকরা চ'লে গেলে আর এক বছরের জন্য তারা ঘরসংসারও করতো। একবার ফুলমতীর কি হ'লো, পালানোর সময় হ'লে সে বললো যাব না, শত অনুনয়েও সে দৃঢ় হ'য়ে রইলো।

রংবরের পালানোর জোর কমে গিয়েছিলো। ক্লান্ত ভঙ্গিতে গরু-বলদ তাড়িয়ে নিয়ে সে বনে গিয়েছিলো। ফিরে এসে সে যা আশঙ্কা করেছিলো তাই দেখতে পেলো। ঘরদোর তচনচ হয় নি, গোলার ধান গোলাতেই আছে কিন্তু ফুলমতী নেই। সাত আট মাস পরে ফুলমতী ফিরে এলো। রংবর সাত আট মাস নীরবে থেকে নীরবে থাকার প্রথম পাঠ রপ্ত ক'রে নিয়েছিলো। তারপরে পঞ্চাশ বছর পার হ'য়ে গেছে। তহসিলদারদের রীতি বদলে গিয়েছিলো আকস্মিক-ভাবে। শুধু ফুলমতী যেন একটু বাক্‌হীনা হ'য়ে গেছে। ফুলবরের জন্ম হ'লো বছর দু'এক পরে। তাকে মানুষ ক'রে তুললো, যৌবন থেকে জরায় পৌঁছে গেলো সে নিঃশব্দে। একটা নেশা আছে তার— ঘরে ব'সে এণ্ডি বোনা। এণ্ডির পোকা চাষ করে সে নিজে, সুতো কাটে, হাত-তাঁতে দুরূহ ও সোজা নকশার, কখনো বা সাদা জমির এণ্ডি বোনে সে।

তার জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার এটি কি একটা উদাহরণ মাত্র। কিন্তু সেই স্থির হয়ে থাকা তার রক্তস্রোতেও সঞ্চারিত হয়ে গেছে যেন।

মাতালু নিজের ঘরের মধ্যে খানিকটা ঘুরে বেড়ালো তারপর সে রংবরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধা ফুলমতী চরকায় সুতো কাটছিলো।

মাদুরের এক প্রান্তে ব'সে মাতালু বললো, 'রাখেন তোর ঘ্যানর ঘ্যানর আজী, কথা কইবার আসলং।'

ফুলমতী হাতের খেইটা টাকুতে জড়িয়ে চরকা সরিয়ে রাখলো।

'কন।'

'গল্প শুনিম।'

মাতালু অনুভব করেছিলো ফুলমতীর মতো দুঃখদাহনের এমন অভিজ্ঞতা আর কারো নেই। ভাটিয়াদের সঙ্গে ফুলমতীর মতো

তুখিয়ার কুঠির আর কারোই অত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। রাজার সিপাইদের গল্পটা সে জানতো।

কিন্তু কি শুনতে চায় মাতালু? পবিচয়ের ফল কখন ভালো হয় না, ভাটিয়ারা কখন আদিবাসীদের সম পর্যায়েব মানুষ ব'লে মনে করে না। পশু মনে ক'রে পীড়ন কবে না বটে সব সময়ে, কিন্তু পার্থক্যটা সব সময়েই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

মাতালু বলল, 'আজী, কন, মাল্তীক তোব মনে ধরে?'

বৃদ্ধা ফুলমতী মাতালুব চাল-চলন থেকে মালতীর প্রতি তাব মোহটাকে খানিকটা আন্দাজ কবেছিলো। সে বিস্মিত হয় নি, কিন্তু মনে মনে অনুমোদন করতে পারে নি বিষয়টাকে। ফুলমতীর অভি-জ্ঞতা এক সময়ে তাকে দগ্ধ করেছে, কিন্তু সেটা বহু দূরেব ঘটনা এখন তাব অন্তর সংকীর্ণ হ'য়ে আসে না সে অভিজ্ঞতার বিদ্বেষে। মালতীকে অনুমোদন না-করাব কারণ সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমানেই আছে। কালো এই ভাটিয়ার মেয়েব মধ্যে কি যে দেখতে পেলো মাতালু কে বলবে। নিচু ক'রে কাটা ব্লাউজের গলা থেকে কণ্ঠার হাড় উঁকি দিচ্ছে যতই সেখানে চিকচিকে সোনার হার থাক। এমন কি স্তন দু'টিও সুগঠিত সুউন্নত নয়। মুখের দিকে চেয়ে দেখবে চোখা চোখা নাকে আকাশী নীল রঙের পাথরেব নাক ফুল। কিন্তু টানাটানা চোখ দু'টিতে যতই কাজল আঁকা থাক—সেখানে প্রশান্তি নেই। বরং একটা ক্ষুধার আভাস। এ ক্ষুধাই যেন, এই অতৃপ্তিই যেন ভাটিয়াদের বৈশিষ্ট্য। এ মেয়ে কি কখনো স্তব্ধ শান্ত হ'য়ে সেবা করতে পারে? আর তাই যদি না পারবে কি দিয়ে বাঁধবে স্বভাবচপল পুরুষকে, স্বভাব-সন্ন্যাসী পুরুষ কিসের মোহে ঘরে থাকবে?

ফুলমতীর মনে হ'ল মাতালু শক্ত একটা মতামত শুনতে চায় না, কি হবে মালতীর সম্বন্ধে তার নিজের মতামত প্রকাশ করে!

ফুলমতী বললো, 'ভাল-ইতো দেখও।'

কিন্তু এ-কথায় মাতালু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো না। সেটাই স্বাভাবিক হ'তো। বরং একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার। দিনেক দু-দিনে তার জীবনের মূল অনুভবগুলিতে একটা পরিবর্তন এসে গেছে। মালতীর সান্নিধ্য ভাল লাগতো। শৈশবের ক্রীড়াসঙ্গিনীর দেহে যখন যৌবন এলো, তার নিজের সুপ্ত-যৌবনের অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা তখন সেই সান্নিধ্যে আরও গভীর কিছু অনুসন্ধান করছিলো। কিন্তু একটা আঘাত পেয়ে তার যৌবন যেন পুরোপুরি স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে। যেটা ধীরে ধীরে হ'তো সেটা হয়েছে মুহূর্তেকে। ওভারসিয়ারের কাছে থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরতে ফিরতে শুধু সান্নিধ্য নয়, তার চাইতেও এগিয়ে গিয়ে কোন পরিণতির সন্ধান করেছিলো তার মন। যেন ওভারসিয়ারের কাছে অবনত হওয়ার ক্লেশ স্বাকারের পক্ষে শুধু মাত্র সান্নিধ্যই যথেষ্ট পুরস্কার নয়।

কিন্তু পরিণতির সন্ধান করতে গিয়েই বাধাগুলির বাস্তব দৃঢ়তা তার চোখে পড়েছে। দুস্তর সামাজিক ব্যবধান, সে ব্যবধান ভাটিয়ারা বাড়িয়েই চলেছে। নদীনালা শুকিয়ে ছোট হয়, যানবাহনের উন্নতি হ'লে দেশে দেশে দূরত্ব ক'মে যায়, কিন্তু আকাশ কখনো সংকীর্ণ হবে? দুইটি তারায় কখনো সাক্ষাৎ হ'তে পারে? সান্নিধ্যটা এমন নির্দ্দিষ্ট না-হ'লে হয়তো ব্যবধানটাও এত প্রত্যক্ষ হ'তো না।

জ্ব'লে মরতেও সাধ যায়, দূবে পালাতেও ইচ্ছা করে। এরকম অবস্থাই হয়তো ফুলমতীরও হয়েছিলো। সব দিক দিয়ে যাকে নির্বুদ্ধিতা ব'লে মনে হয় তাকে ভুলে যাওয়াই ভালো। ফুলমতী ভুলে গেছে, এখনকার এই স্থবিরত্বে নয়, সেই উন্মুক্ত দিনগুলির মধ্যেই সে ভুলে যাওয়ার মতো একটা আশ্রয়দ্বীপ আবিষ্কার করতে পেরেছিলো।

কিন্তু মাতালু জানতো না, দেহ যেমন অচিন্ত্য কামনাকে উদ্বুদ্ধ করে তার সান্নিধ্যই তেমনি নিবিয়ে দিতে পারে সে কামনাকে।

করছে। ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজছে, ক্রেনের শিকল নামছে মোটা লোহার বিম নিয়ে।

সাহেব পাড়ায় এঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়ারদের বাংলো উঠেছে।, সেখানে রাস্তাগুলো সব পিচে বাঁধানো। মজুরবস্তিগুলোর সামনের পথে এক হাটু ধুলো। বর্ষায় মানুষের পায়ে চষা জমির মতো চেহারা নিয়েছিলো পথগুলো। গাড়ির চাকায় চাকায় সে কাদা স'রে গিয়ে খানাখন্দ হয়েছিলো এখানে সেখানে। এখন শুকিয়ে-যাওয়া মাটি ধুলো হয়ে উড়তে থাকে মানুষের পায়ে পায়ে। খানাখন্দগুলিতে পাশের বস্তি থেকে জল এসে জমা হয়। ট্রাকগুলি সে জল বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে টালমাটাল ক'রে, মবিল ভাসা কাদাজল ছিট্‌কে ওঠে, তবু গতি কমে না তাদের।

সন্ধ্যাতেও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। তাঁবুতে তাঁবুতে ডে-লাইটের আলো জ্বলে। লোহার মিস্ত্রিদের পাড়ায় এসেটিলিনের চোখ-ধাঁধানো আলোয় ওভারটাইমের কাজ হয়। শ্রমিকদের কোন কোন মহল্লায় বসে জুয়া[illegible] আড্ডা। কেউ [illegible] ও ঢোল [illegible]টিয়ে [illegible]তে বস্বরে গান করে তারা। বাজারে [illegible] আলো জ্ব'লে ওঠে দোকানে দোকানে। বেশ্যাপল্লীতে হট্টগোল সুরু হয়। আর তার মধ্যে থেকে কোন মুসলমান শ্রমিক অকস্মাৎ আজান দিয়ে ওঠে চিৎকার ক'রে।

হাট-ফেরত গ্রামবাসীদের হাতে হাতে মশালের আলো জ্বলে। সে আলোয় পথের ধুলোয় আচ্ছন্ন বাতাস কুয়াশার মতো দেখায়।

নায়েব আহিলকারের খেদটা এখন নেই। এঞ্জিনীয়ার ওভারসিয়ার নয়। মর্যাদায় ও বেতনে সে নায়েব আহিলকারের সমকক্ষ। তার স্ত্রী অত্যন্ত মিশুক, ইতিমধ্যে নায়েব আহিলকারের গৃহিণীর সখী হ'য়ে উঠেছে সে। ব্রিজ রংকরা রং ইতিমধ্যে বিনা স্যাংসনেই নায়েব আহিলকারের বাংলো রঙাতে সুরু করেছে। সন্ধ্যার চায়ের আসর

কোনদিন বসে নায়েব আহিলকারের বাড়িতে কোনদিন এঞ্জিনীয়ারের কুঠিতে। সেখানে মহকুমা শাসনের কথা এবং ব্রিজ তৈরির কথা একইভাবে আলোচিত হয়।

॥ এগারো ॥

মালতীর বড়দাদা ও ছোড়দাদা আজকাল গদাধরপুরেই বাস করছে। শহরের বাড়িটা তাদের বড় নয়, অসুবিধা হয়। তা সত্ত্বেও মালতীর বউদিদিও ছেলেমেয়ে নিয়ে সেখানে গেছে। মা জিজ্ঞাসা করেছিলো। বড়দাদা বলেছে এখন পিছিয়ে থাকার অর্থ হবে ভাগ্যকে পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে দেখা। সকাল সাতটায় দোকানে বিক্রি সুরু হয়, রাত এগারোটার আগে ঝাঁপ ফেলা যায় না। তারপর আলো জ্বেলে দু'ভাই বসে হিসাব করতে। টাকা পয়সার আমদানি দেখে, মালের পরিমাণ যাচাই করে। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে বিছানায় যেতে রাত দুপুর পার হ'য়ে যায়। কিন্তু সেটা রোজ নয়। অনেকদিনই দুই ভাই-এর একজনকে খোঁজ করতে হয় সদরে যাওয়ার ট্রাকের অন্ধকার পথে পথে ঘুরে। ট্রাক পেলে তাতে চেপে সদরে যেতে হয়। মাল কিনে বেলা আটটার মধ্যে না ফিরলে মান থাকে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হ'লে খাটতেই হবে।

দুখিয়ার কুঠিতে মালতী, তার মেজদাদা এবং তাদের মা আছে। মা একদিন বলেছিলো, 'যা না তুই শহরে। তোর ভাইরা কি করছে দেখে আয়।'

মেজদাদা সব কথার মতো এ কথাটাও এড়িয়ে গেলো, 'দেখা যাক।'

মালতীর মা ভেবেছিলো তার দু'ছেলে অজস্র অর্থ উপার্জন করছে। এ অবস্থায় যদি তার মেজছেলে দূরে স'রে থাকে পরে

একদিন সে-অর্থের মালিকানা নিয়ে ভ্রাতৃদ্রোহ সুরু হ'তে পারে।

এদিকে ধানের সময় যাচ্ছে। একদিন চাষীরা এসে বলেছিলো মেজদাদাকে ধানের জমির ঘাস নিড়িয়ে দিতে হবে। মজুরি এবার অন্যান্য বারের চাইতে বেশী। শহরের কাজে অজস্র অর্থ-ব্যয় হচ্ছে। নানা সূত্রে তার দু-এক কণা গ্রামবাসীদের হাতে এসে পৌঁছাচ্ছে। অর্থ এখন দুর্লভ কিছু নয়।

মেজদাদা বলেছিলো, 'দাদাকে বলো।'

তারা বললো, বড়বাবু বলেছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে।

মেজদাদা বলেছিলো 'বেশ তা হ'লে যা ভালো বোঝ করো।'

কথাটা কেউ ব'লে দেয় নি কিন্তু অলিখিত অনুচ্চারিত ভাবে সংসারের কর্তব্যভার ও কর্মক্ষেত্র মালতীর দাদারা ভাগ ক'রে নিয়েছে। এবং এটা যে স্থায়ী হ'য়ে যাবে এমন সম্ভাবনাই যেন দেখা দিচ্ছে। ব্যবসায়ের তাড়াহুড়ো ছুটোছুটির পক্ষে মেজদাদা, রুচি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে অপটু হ'য়ে পড়ছে। গ্রামের কাজগুলি, জমিজমা তদারক করা, তেজারতির টাকা আদায় করা এসব কাজ তবু মেজদাদার পক্ষে সম্ভব।

কিন্তু দিয়ে সুরু ক'রে মালতী অনুভব করে, এর মধ্যে যেন একটা উপেক্ষা-অভিমানের ব্যাপার আছে। একটা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যেতে পারে। বড়দাদাদের দিকে যেমন একটা উপেক্ষার ভাব আছে, মেজদাদার পক্ষে যেন তেমনি অভিমান।

মেজদাদার কিন্তু এসব খুঁটিনাটিতে দৃকপাত নেই। ড্রেসিং গাউন গায়ে, মুখে সিগারেট দিয়ে বেলা এগারোটা পর্যন্ত সে হয় তার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় কিংবা ইজি চেয়ারে প'ড়ে থাকে। মালতী ডেকেডুকে চা খাওয়ায় তখন। ছুটির দিনের ঢিলেঢালা গড়িয়ে-যাওয়ার ভাব। তার অন্য দুই ভাই পক্ষান্তরে সময়ের পাখায় ধেয়ে চলেছে।

এটা একটা কৌতুক যেন। শিক্ষা ও রুচির দিক দিয়ে যার সঙ্গে শহরের জীবনের সব চাইতে মিল হওয়া উচিত, সেই প'ড়ে রইলো গ্রামে। আর রুচির দিক দিয়ে যারা গ্রাম্য, অর্থোপার্জনের বস্তুতান্ত্রিক স্থূল আবেগ ছাড়া যারা অন্য কোন আকর্ষণকেই স্বীকার করে না, তাদের স্থান হ'লো শহরে।

মেজদাদা ছাড়া এ বিষয়ে আলাপ করবার মতো আর কেউ নেই মালতীর আশে পাশে। মেজদাদাও হু-হাঁর বেশী কিছু বলতে নারাজ। অমন সুন্দর ক'রে কথা বলতে পারে মেজদাদা, অথচ নিজে থেকে ডেকে কারো সঙ্গেই কথা বলে না আজকাল।

মালতী এক সন্ধ্যায় তার পাশে ব'সে বলেছিলো, 'গান গাইব, মেজদাদা?'

একটু যেন বিস্মিত হ'লো মেজদাদা, 'গাইবি? তা ভালোই হয়।'

গান শেষ হ'লে মেজদাদা মালতীর মাথার উপরে একখানা হাত রেখেছিলো, কিন্তু তার উদাসীনতাও ধরা পড়েছিলো মালতীর কাছে। শরীরের দিক দিয়ে নয় শুধু, মনের দিক দিয়েও যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মেজদাদা।

আজকাল ওভারসিয়ার তেমন ছুটি পায় না, কারণ তার মাথার উপরে এঞ্জিনীয়ার আছে। সপ্তাহে একদিন সে আসে। ফরেষ্টার আরও কম। তারও হঠাৎ কাজ বেড়ে উঠেছে।

বৌদির ছেলেপুলে হবে এ সংবাদ এলো একদিন গ্রামে। মা শহরে চ'লে গেলেন।

বাড়িতে মেজদাদা এবং মালতী। মালতী ভাবলো এই অবসরে মেজদাদার মনোভাব কিছু দূর করবে হেসে, গল্প ক'রে, দিবারাত্রি সাহচর্য দিয়ে। এত খুশী মালতীকে কেউ কোনদিনই দেখে নি।

মেজদাদাকে চা দিয়ে সে চ'লে যায় না, নিজের কাপটা নিয়েও সে তার পাশে ব'সে পড়ে। মেজদাদাকে অনুকরণ ক'রে, মনে মনে আউড়ে সে কবিতা আবৃত্তি করার সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে। হয়তো বা চায়ের কাপ হাতে সে ব'লে ওঠে -আজি দিবসের শূন্য নয়নে কাজল পরালো কে ?

ইতিমধ্যে ফরেষ্টার এসেছিলো একদিন। সঙ্গে এনেছিলো চাংড়ি ভ'রে বনমোরগ। মেজদাদাকে খুশী করার তাগিদে অপরিচিত পুরুষ ফরেষ্টারকে সঙ্গে নিয়ে মালতী একটা চড়ুইভাতি করার মতো আনন্দে মেতে উঠেছিলো।

কিন্তু মালতীর সব চেষ্টা একদিন ব্যর্থ হ'য়ে গেলো।

ভয় পেয়ে সে বললো, 'মেজদা তোমার ওষুধ কি ফুরিয়ে গেছে ?'

'আনাই নি আর।'

কি হবে তা হ'লে, কি হবে ? পাংশু বিবর্ণ মুখে মেজদা তেমনি স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছে। এর পর পায়চারি সুরু হবে হয়তো, ডাকলেও সাড়া দেবে না ; সারা রাত ধ'রে চটি টেনে টেনে ঘুরে বেড়াবে।

মালতী তার নিজের ঘরে ছুটে এসে দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে বারংবার বলতে লাগলো ঃ ভগবান, তেমনি আর একটি রাত্রি থেকে আমাকে রক্ষা কর।

সমস্তটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছে। বিকেল গড়িয়ে যেতে লাগলো যত তত বাড়তে লাগলো অস্বস্তি। মালতীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগলো। গরম জল চায় মেজদা, তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় মালতী। মেজদাদা বলে, না দরকার নেই। নিজের ঘরের মধ্যে ফিরে ফিরে আসে মালতী। মনে মনে বলে —না না আমি পারব না। মেজদা, আমাকে তুমি এমন নির্দেশ দিও না। মাতালু ছোটবেলার সঙ্গী কিন্তু এখন সে ছোটবেলার মন নিয়ে ব'সে নেই। সে আমার কথা

রাখবে। কিন্তু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সে আমার মধ্যে শুধু ছোটবেলার সঙ্গীকেই খুঁজে পায় না, তার চোখে সে যাওয়া একটা কিছুর আশ্বাসের মতো। আমি তাকে যা দিতে পারি না তারই প্রতিশ্রুতির মতো তার সামনে দাঁড়াই। আমি তাকে আর কোন হুকুমই করতে পারব না।

সন্ধ্যায় মেজদাদার ঘরের কাছে এসে সে দেখলো ঘরে তালা ঝুলছে। সে ভাবলো মেজদাদা ওষুধ আনতে নিজেই গিয়েছে। একটা স্বস্তি বোধ হ'লো তার। এবং সে স্বস্তিবোধটার দরুন সমস্ত বাড়িটায় সে একা এ অস্বস্তি তার কাছে বড়ো হ'য়ে উঠতে পারলো না।

রাত্রির প্রথম প্রহরে পায়ের শব্দে চোখ তুলে সে দেখলো মাতালু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়ানোর আগে টের পায় নি। তার ছোটবেলার ধারণাটা কিছুক্ষণের জন্য আবার তার মনে এলো। প্রয়োজন হ'লে ছায়ার মতো নিঃশব্দে এই আদিবাসীরা চলতে পারে।

'কি, মাতালু?'

'তোমার মেজদা কইলেক, কিছু দেরি হইবে ফিরবার।'

তবুও ভালো মেজদাদার খবর পাওয়া গেলো। মাতালুর উপরে খুশীই হ'লো মালতী। সুস্থ সবল হাস্যময় মাতালু। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা তার এমন যে নির্ভর করা যায়।

'তোমার খবর কি মাতালু?'

'খবর কি কঙ্।' মাতালু হাসলো।

মেজদাদার কথা থেকে স'রে যাওয়ার জন্যই মাতালুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু মেজদাদার কথাই তাকে বলতে ইচ্ছা করছে। বাড়ির কাউকে সে বলতে পারে নি কিন্তু মাতালুকে বলবার জন্য একটা অন্ধ অযৌক্তিক তাগিদ সে অনুভব করলো। সেদিন তাকে

সে ওষুধ আনতে পাঠিয়াছিলো যেন সে কথা ব'লেই তার মনকে হাল্কা করা দরকার। কিন্তু মালতীর ভয় ভয় করতে লাগলো; যেন কি একটা প্রতিরোধ ধ্ব'সে পড়বে, চুরমার হ'য়ে যাবে। কিছুদিন আগেও এ ভয়ও ছিলো না, কাল্পনিক প্রতিরোধটাও তৈরি হয় নি।

'আচ্ছা মাতালু, তুমি যাও।'

মাতালু মালতীর মুখের দিকেও তাকালো না। মুখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, মুখ নিচু ক'রেই চ'লে গেলো।

মধ্যরাত্রিতে মেজদাদা ফিরলো।

'এসেছ, মেজদা, খাবে তো?'

'না। একটু জল দে।'

জল নিয়ে মেজদাদা দরজা বন্ধ ক'রে পড়ে ছিলো।

মালতীর ঘুম ভালো হওয়ার কথা নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তার চাইতে বাস্তব সহস্রগুণে মর্মান্তিক হ'য়ে থাকে। ভোর হওয়ার কিছু আগে একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভেঙেছিলো মালতীর। পাশের ঘরে মেজদাদা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সে জানালা দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখতে পেলো বন্ধ দরজার গোড়ায় মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে আছে মেজদাদা, যেন দরজা খুলে বেরুতে গিয়ে আর পারে নি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে মেজদাদাকে জাগাবার ব্যর্থ চেষ্টার পর মালতী সেই অন্ধকার রাত্রিতে ছুটে বেরুলো।

মাতালুর ঘুম ভাঙিয়ে তাকে সঙ্গে ক'রে দৌড়তে দৌড়তে নিজেদের বাড়িতে যখন ফিরে এলো মালতী, তখন সে আর কথা বলতে পারছে না। দরজা খুলবার বৃথা চেষ্টা দু'এক বার ক'রে মাতালু খোলা জানালাটাকে আক্রমণ করলো। প্রাণপণ চেষ্টায় জানালার গরাদে বেঁকিয়ে যে ফাঁকটুকু করতে পারলো তা দিয়ে তার প্রকাণ্ড শরীরটা গলিয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু মালতীকে পার ক'রে দেয়া গেলো।

মালতী দরজা খুলে দিয়েছিলো। মেজদাদাকে বিছানায় শুইয়ে বালতি বালতি জল এনে মাতালু মেজদাদার মূর্চ্ছা ভাঙানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু মালতীই অবশেষে হুহু ক'রে কেঁদে উঠে বললো; 'কি করছ মাতালু, কা'কে তুমি বাঁচাবে?'

॥ বারো ॥

ভয় এবং অবিশ্বাস।

ক্ষতির ভয়, আর লাভের আশ্বাসের প্রতি অবিশ্বাস।

কাঁকরুর জমিকে গ্রাস করার ব্যাপারে যে ভয়ের সূত্রপাত, তাকে নানা রূপে দেখবার আশঙ্কা যেমন যায় নি, কাঁকরু ক্ষতিপূরণ পাবে, এই দেশ ইতিমধ্যে সে একটা চাকরি পেয়েছে, এসব আশ্বাসেও তেমন কারো বিশ্বাস জন্মায় নি। এটাকে উদাহরণ ব'লে ধ'রে নিলে এমন অন্য অনেক উদাহরণে পৌঁছানো যাবে। যার কিছুমাত্র মূল্য ছিলো না, এখন তারও মূল্য হয়েছে এটা যেমন আশ্বাস, বহুদিন ধ'রে যার মূল্য ছিলো, সেটা একান্ত মূল্যহীন হ'য়ে যাবে এটা তেমনি একটা আশঙ্কা।

জীবন যাকে অহরহ সতর্ক স্নেহ দিয়ে লালন করা হ'য়ে থাকে, অন্যকে ধ্বংস ক'রেও যাকে রক্ষা করাই চিরাচরিত বিধান, তার উপরেই নাকি মানুষের ঘৃণা আসে, তাকেই নাশ করার জন্য নাকি মানুষ পরিকল্পনা করতে পারে! সদরের রাসের মেলায় নানা রকমের মাটির পুতুল সাজিয়ে পুরাণের গল্প, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান দর্শকদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরার ব্যবস্থা আছে। বীরত্ব, শৌর্য, করুণা, স্নেহ প্রভৃতিকে অবলম্বন ক'রে সে সব শিল্প দর্শকদের মুগ্ধ করে। মাতালুর প্রাণ ভ'রে ওঠে, ঘণ্টার পরে ঘণ্টা কেটে যায় তার চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে। ভাটিয়াদের প্রতি সে একটা শ্রদ্ধা অনুভব করে। কিন্তু একবার সে একটা আঘাত পেয়েছিলো।

অনেক পুতুলের মধ্যে সে-বার একটা পুতুল ছিলো—মনোহর পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারভূষিতা একটি মহিলা নিজের হাতের খড়্গে নিজের মুণ্ডচ্ছেদ করেছে, আর অপর হাতে নিজের সেই খণ্ডিত মুণ্ড ধারণ ক'রে আছে, ফোয়ারার কায়দায় লাল রঙের জল রক্তের মতো সেই মুণ্ডের মুখে ঝ'রে পড়ছে ছিন্ন কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'য়ে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না-পেরে বারংবার মাতালু সেই অদ্ভুত ছিন্নমস্তা মূর্তির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যেন একটা মোহ আছে তার। অবশেষে তার শরীর এবং মন দুই-ই প্রতিবাদ জানিয়েছিলো। অসুস্থ বোধ ক'রে মাতালু গ্রামে ফিরে এসেছিলো। এটাই একমাত্র ব্যাপার নয়, এমনি অদ্ভুত কিছু ক'রে বসার একটা প্রবণতা ভাটিয়া মাত্রেরই আছে। নতুবা ভাবো, কি ক'রে মালতীর মেজদাদা নিজেকে নিজে মেরে ফেললো। অনেক মৃত্যুর কথা রংবর জানে কিন্তু দুখিয়ার কুঠিতে নিজের জীবনের উপরে কেউ হাত দেয় নি আজ পর্যন্ত। সেটা যে সম্ভব তা কেউ কল্পনা করতেও যেন পারে না। অথচ ঘ'টে যাওয়ার পরে এখন অবাক লাগছে ভাবতে, সেটা এমন একজন সাধারণ চেহারার ভদ্রব্যক্তি ঘটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও এ ধরণের চিন্তার আর একটি পর্যায় আছে। সেখানে পৌঁছুলে মনে হয়—মৃত্যু নানা দিক দিয়ে আসে, নানা মূর্তি তার। এ মূর্তিটা এত দিন প্রকাশিত হয় নি, হয়তো বা এখন থেকে হবে। এও একটা আশঙ্কা। দুখিয়ার কুঠিতে অনেক বাড়িতে সাদা কাপড়ের টুকরো বাঁশের মাথায় উড়তে দেখা যাচ্ছে আজকাল। নতুন লোক এসে তার কারণ খুঁজে পাবে না। মদন-কামের পূজোর সময়ে অনেক লাল পতাকা অনেক বাড়ি থেকে পতপত ক'রে ওড়ে। তখন বিদেশী কেউ এসে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো সে পূজোর এক কলি গানও শুনতে পাবে। কিন্তু এখন এই সাদা পতাকার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই। ঠিক উত্তরটা না-দেয়াই প্রথা। ওতে বিপদ থেকে রক্ষা

পাওয়ার নানা তুক্ আছে।

আর মাতালুর মনে কিভাবে ধারণাটা হ'লো তা বলা কঠিন, কিন্তু হয়েছে তা বলা যায়। গদাধরের ব্রিজ যেমন আকাশকে পরিহাস ক'রে দেখ-দেখ ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে, তার সঙ্গে যোগ রেখে অনেক বেদনা, নতুন আধি-ব্যধি দেখা দেবে এ অঞ্চলে। দুখিয়ার কুঠি বাঁচবে না তার হাত থেকে। বরং যেভাবে দুখিয়ার কুঠিতে অনিবার্য একটা শহরমুখো টান ধরেছে তাতে মনে হয় অন্যান্য গ্রামের চাইতে দুখিয়ার কুঠিতে এই নতুন বেদনাগুলি আগে আসবে। পাখি উড়ে যাওয়ার সঙ্গে গাছ থেকে ফল পড়া, এ দু'টো ঘটনায় কখনই কোন যোগাযোগ নেই, এ ভাবাও অযৌক্তিক। রংবর জানে শহর-বাসীদের অনেক ব্যাধি আছে যা তাদের পক্ষে তত মারাত্মক নয় যতটা হ'য়ে দাঁড়ায় তাদের সংস্পর্শে এলে গ্রামবাসীদেব। সম্পূর্ণ অজানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাব যখন হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই তা শহর থেকে বহন ক'রে আনে গ্রামবাসীরা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা নেশা আছে শহরের। ছিন্নমস্তার ভয়ে কেউ রাসের মেলায় যাওয়া বন্ধ করে না। মাতালুও গদাধরপুরে যায়।

প্রথম যেদিন সে মোটর-ট্রাকে উঠেছিলো সেদিনের অভিজ্ঞতা সহজে ভুলবার নয়, কিন্তু তরঙ্গের পরে তরঙ্গ, একের পর এক নতুন অভিজ্ঞতা, একই অভিজ্ঞতার নবতর রূপ। মোটর-ট্রাকে ওঠা এখন এমন কিছু বড়ো কথা নয় মাতালুর পক্ষে, সে আজকাল পায়ে হেঁটে খুব কমই যাতায়াত করে গদাধরপুরে। পথের ধারে সে দাঁড়িয়ে থাকে, চলতি ট্রাক থামিয়ে ওঠে সে, যেখানে ব্রিজ হচ্ছে সেখানে গিয়ে নামে। দু'একজন ড্রাইভারের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত ড্রাইভারও টাকা পেলেই আর কোন আপত্তি করে না।

অথচ অন্যান্য গ্রামবাসীর মতো মাতালু শহরে কাজ নিয়ে যায় না।

শহরে গেলে হয় সে বাঁধের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নতুবা যে-সব জায়গায় কাজ হচ্ছে তার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রি-মজুরদের কাজ দেখে। ঘাটিয়ালের চালায় ব'সে অর্ধসমাপ্ত ব্রিজের উপরে ব্যস্ত সমস্ত মজুরদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। মানুষগুলি বড় বড় পিঁপড়ের মতো দেখায়।

দু'একজন মিস্ত্রির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। বেশ মানুষগুলি, হাসিখুশি গল্পবাজ। স্ফূর্তির নানা রকম উপায় উদ্ভাবন করতে তাদের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্রিজ তৈরি করার মতো জটিল কাজকর্মে। কিন্তু কি যে বোকা তারা। ধান থেকে চাল হয় জানে কিন্তু কখন কোন ধান লাগাতে হয়, সব সময়ে কেন মিহি-চালের ধান হয় না, সে সব সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নেই; আকাশের মেঘ দেখে বলতে পারে না বৃষ্টি হবে কিনা; চাঁদ দেখে তিথি ব'লে দেয়া দূরের কথা। এ সব তবু সহ্য করা যায় কিন্তু ভাবো তাদের স্ত্রীকে ছেড়ে থাকার কথা। স্ত্রীকে যদি বছরে আট দশ মাস দূরে দূরেই রাখবে তবে বাকি দু'এক মাসের জন্য তাদের স্ত্রী করা কেন? একজন বলেছিলো—বালবাচ্চা আছে। মাতালুব বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো—ওরে নির্বোধ, স্ত্রী আগে তারপরে ওরা। কিন্তু মাতালু একটা বেদনা বোধ করে মিস্ত্রিদের জন্য এবং সে কারণেই নির্দয়ের মতো তাদের নির্বোধ মনে করতে পারে না। ওরা যেন একটা জালে ধরা পড়েছে, যার জন্য এত শ্রমশক্তি ও বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীকে, ছেলের মাকে এই বিদেশে আসতে হয়। অবাক কাণ্ড এই, সেই জাল কেটে বেরুতে, এরা চায় না যেন। মাতালুর স্ত্রী নেই, কিন্তু ভাবতে গিয়ে তার মনে হয় এ-রকম করার চাইতে সে বনে চ'লে যাবে স্ত্রীকে নিয়ে। এর পরেই তার মনে আসে—সবই যদি ভালো তবে এদের জীবন এ-রকম কেন? এও তো নিজের মনকেই মেরে ফেলা। মালতীর দাদার রোগের মতোই কিছু।

এ-সব সত্ত্বেও অগ্নিকাণ্ডের কিংবা প্লাবনের ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে যে একটা আকর্ষণ আছে, তেমনি কিছু যেন আছে এই কালো নদীর ছুটে চলার মধ্যে। আর বোধ হয় কাঁকরুর সঙ্গে দেখা হয় না ব'লে, কারণ কাঁকরু এখন চাকরি করে, এবং মালতীকে সে ভুলবার চেষ্টা করেছে ব'লে, কারণ সে অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছে মালতী তার পক্ষে আকাশের চাঁদ,—সে শহরের টানটা আরও বেশী অনুভব করে।

একদিন রংবর বলেছিলো, 'শহরৎ যাইস ?'

'হয়।'

আর কিছু রংবর বলে নি। বলা তার স্বভাব নয়। জীবনে শোক ছাড়াও এমন কোন কোন সময় আসে যখন তাকে অন্য বিষয় নিয়ে ভুলে থাকবার সুযোগ দিতে হয়। সে ফুলমতীর কাছেই শুনেছে মালতীর বিয়ের কথাবার্তা চলেছে। এমন একটা দুর্ঘটনার এত কাছাকাছি সময়ে এমন একটা আনন্দের বিষয়ের অয়োজন অরুচিকর শোনায় কিন্তু মালতীর নিজের মঙ্গলের জন্যই এটা করতে হচ্ছে। মেজদাদার মৃত্যুর পর থেকেই তার ফিটের ব্যারাম হয়েছে। থেকে থেকে হঠাৎ একটা আকস্মিক আক্ষেপ আসে। সদরের ডাক্তার বলেছে, বিয়ে হ'লে ছেলেপুলে হ'লে সারে এ অসুখ, ওষুধপত্র বড়ো কাজ করে না। ফুলমতী ঝাড়তে গিয়েছিলো। তার মন্ত্রতন্ত্রে ফল হ'লো কি না-হ'লো হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিলো মালতী। চারিপাশে লোকজন দেখে বিশেষ ক'রে ফুলমতীকে দেখে সে ব'লে উঠেছিলো : আ—ছি-ছি, একি করেছ তোমরা ? তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো কাঁদতে কাঁদতে। মালতীর দাদারা যুক্তি পরামর্শ করে স্থির করেছে, মেজভাই-এর মৃত্যুতেই এ-রকমটা হয়েছে। বাড়ির মধ্যে ওরা দু'টিই পরস্পরকে সব চাইতে বেশী ভালবাসত। তাদের কাকা

বলেছেঃ এই অবস্থায় বিয়ে দিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই মনের অসুখ সারাতে মনকে অন্য খাতে নিয়ে যাওয়া দরকার। রংবর যখন এতটা জানে তখন মাতালুও কিছু নিশ্চয় জেনে থাকবে।. অসম্ভবের ভালবাসা হ'লেও মালতীকে সহজে ভুলতে পারবে না মাতালু। দশজনের সঙ্গে মেলামেশা করা বরং ভালো। কারো কারো জীবনে কেন যে অকারণ বিপত্তি এসে জমা হয়!

মাঝে মাঝে শহর থেকে ফিরতে রাত হ'য়ে যায় মাতালুর। বাঁধের উপরে ঘুরে বেড়ানো এবং ঘাটিয়ালের ঘরে ব'সে ব্রিজের কাজ দেখা ছাড়াও অন্যান্য আকর্ষণ আছে শহরের। সদরের রাস উপলক্ষে যে মেলা হয় সেটা আয়তন ও আয়োজনে বিরাট কিন্তু সাময়িক, আর এখানে যা হয়েছে সেটা যেন ছোট হলেও চিরস্থায়ী। যেখানে হাট বসতো সেখানে সারি সারি দোকান। সন্ধ্যায় যখন সবগুলো দোকানে আলো জ্ব'লে ওঠে, দোকানে সাজানো মনোহারী কাঁচের জিনিসগুলি ঝকমক করতে থাকে, মাতালুর ভালো লাগে সেই স্বর্গপুরীর মধ্যে অকারণে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে।

ইতিমধ্যে মাতালু একদিন আবিষ্কার করেছে আকর্ষণের মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণ। দেয়ালের গায়ে নানা রঙের ছক কাটা একখানা কাঠের ফলক, পয়সা বাজি ধ'রে পালক-পরানো ছোট ছোটো তীর ছুঁড়ে মারতে হয়। যে রঙে টাকা পয়সা রেখেছ সেই রঙে তীর বিঁধতে পারলেই পয়সা দ্বিগুণ ফিরে পাওয়া যায়। প্রথম দিনে হেরে গিয়ে দুঃখ হয়েছিলো মাতালুর। এখন সে বুঝেছে, ওটা খেলা। উত্তেজনাটাই ওর আনন্দ। কিন্তু তার কৃষক মন স্বভাবতই অপচয়-বিরোধী। এবং সেই মনই সম্ভবত উত্তেজনাটাকে ভালবেসেও তাকে বেহিসেবী নেশা হিসাবে বুঝতে পেরেছে। নেশা ধরে নি তার যেমন অনেক শ্রমিকের ধরেছে।

সেদিন বোধ হয় আকাশে মেঘ ছিলো। বিকেলে সন্ধ্যার

মতো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো। বাড়িতে নিয়ে যাবার মতো কিছু কেনাকাটা করেছিলো মাতালু। যে পথ দিয়ে সে রোজ যাওয়া-আসা করে সেটা ধ'রেই চলেছিলো। এই পথের ধারে পাঁচ সাতখানা নতুন ঘর অন্য বাড়িগুলো থেকে একটু পৃথক হ'য়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে। আজ আকস্মিকভাবে একটা যোগাযোগের মতো ঘ'টে গেলো। মাতালু রাস্তার যে পাশে বাড়িগুলো সেদিক দিয়েই যাচ্ছিলো। চতুর্থ ঘরটা ছাড়িয়ে যেতে যেতে সে থেমে দাঁড়ালো। সে ঘরটার বারান্দায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের আদরায়, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে তাকে যেন চেনা-চেনা মনে হ'লো মাতালুর। সে আর একবার দেখবার জন্য মুখ তুলতেই মেয়েটি বললো 'ও মানুষ, পাশের ঘরের বুড়ীটার অসুখ করেছে।'

কিন্তু মেয়েটি তার বক্তব্য শেষ করতে পারলো না। একটা ভারি ট্রাক একেবারে মাতালুর গায়ের উপর দিয়ে যেন ছুটে এসে থামলো তার ঘরের সামনে। মাতালু পাঁচ নম্বর ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিলো প্রাণ বাঁচাতে। ট্রাক থেকে একজন লোক টপ ক'রে নেমে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বললো—রাখ, রাখ। কিন্তু সেই প্যান্ট-জামা পরা ভদ্রলোকটি তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে ধরে ঘরে নিয়ে গেলো। মেয়েটির খিলখিল ক'রে উপচে-পড়া হাসি শুনতে পেলো মাতালু ; ট্রাকটাও চ'লে গেলো।

বারান্দা থেকে পথে নামবার আগে মাতালুর দৃষ্টিটা কিন্তু পাঁচ নম্বর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঘরটার ভিতরের খানিকটা দেখতে পেয়েছিলো। বিছানার উপর একটি স্ত্রীলোক অসুস্থ অবস্থায় ছটফট করছে, তার শিয়রে কলঙ্কধরা একটা গ্লাসে বোধ হয় খানিকটা জল।

এক পলক দেখে নিতে যে সময়টুকু লাগে তার চাইতে কিছু বেশী সময় মাতালু অসুস্থ স্ত্রীলোকটিকে দেখেছিলো। এর ফলে দু'টি বিপরীত প্রবণতা দেখা দিলো তার মনে—প্রথমটি হচ্ছে অসুস্থার জন্য সমবেদনা দ্বিতীয়টি রোগের কাছে থেকে দূরে স'রে যাবার জান্তব প্রেরণা। দ্বিতীয় প্রেরণাটিকে সাহায্য করলো আর একটি সাবধানী সংস্কার, ভাটিয়ার ফাঁদে না পড়তে হয়। মাতালু নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে গ্রামের দিকে রওনা হ'লো।

এ-কথা এখানে ব'লে রাখা যায় কমলার সঙ্গে মাতালুর পরিচয়ের এটাই নিঃশব্দ সূত্রপাত।

॥ তেরো ॥

মালতীর বিয়ে হ'য়ে গেলো। পাত্র ওভারসিয়ার নয়, লখাই চক্রবর্তী।

মালতীর দাদারা তার মাকে বলেছিলোঃ শহরের এই হট্ট-কোলাহল ক'মে যাবে ব্রিজ তৈরি শেষ হ'লে। শুধু ব্যবসাদাররাই থাকবে তখন, আর রাজকর্মচারীরা। ব্যবসার আভিজাত্যই সুতরাং তাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ওভারসিয়ারের বয়সের দিক দিয়ে পাত্র হওয়ার বেশী যোগ্যতা আছে হয়তো, কিন্তু ব্রিজ তৈরির মতো বিরাট ব্যাপার রোজ ঘটে না যে কাঁচা পয়সা তার নির্দিষ্ট বেতনকে ফাঁপিয়ে তুলবে। এদিকে লখাই চক্রবর্তী এতদিন এদিক-ওদিক ছুটোছুটি ক'রে বেড়ালেও সে সব ছুটোছুটি নিরর্থক নয়, টাকা করেছে সে কিছু কিঞ্চিৎ। আর শহরে যারা স্থায়ী ভাবে বসবাস করবে তাদের মধ্যে আভিজাত্যের দিক দিয়ে সেও একজন হবে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে তার বাড়ি তৈরি করা শেষ করেছে সে। মা হয়তো দেখে নি কিন্তু তার হলুদ রঙের আধুনিক কায়দার বাড়িটা শহরের উল্লেখযোগ্য চার পাঁচটি বাড়ির মধ্যে একটি। আর ব্যবসা? সে শুধু গাঁজা আফিমের দোকানই দেয় না, আড়তদারির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সে প্রকাণ্ড একটা গুদাম তুলেছে। বয়স? চল্লিশ বছর এমন কি বেশী বয়স, তোমার মেয়েরও তো বিশ প্রায় হ'লো।

বিবাহের উৎসব দু-জায়গাতেই হ'লো। শহরে লখাই চক্রবর্তীর

বাড়িতে এবং দুখিযাব কুঠিতে মালতীদেব বাড়িতে।

মালতীদের বাড়িতে যে উৎসব হয়েছিলো তাতে বৈচিত্র্য এনেছিলো ফরেস্টাব। চিবাচরিত মাংসেব পরিবর্তে সে হবিণ মাংসের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলো। দুখিযাব কুঠিতে বহু গ্রামবাসী নিমন্ত্রিত হযেছিলো।

লখাই চক্রবর্তীর বাড়িব উৎসবে ওভারসিযাব এবং তাব ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তনরা ভিড় ক'বে এসেছিলো। নাযেব আহিলকাবও বাদ যায় নি। লখাইযেব বাড়িতে এযো নেই। মালতীর কাকীমাই তাব কাকীমা সেজে বসেছিলো। ডেকে আনা হ'লো এঞ্জিনীযাবেব স্ত্রীকে, নায়েব আহিলকাব গৃহিণীও এসেছিলো। নানা বকম আনন্দই ছিলো কিন্তু এই সাময়িক শহবে যে বিবাহেব আনন্দের মতো আনন্দও এসে পড়বে এ কি আশা করা গিযেছিলো? অজস্র অর্থব্যয় করলো লখাই। শহরের বড়ো এবং মেজরাও তো বটে সেজরাও বাদ পড়লো না সবাই। ওভাবসিযাব এখানে বিচিত্রতাব সন্ধান দিলো। মালতীর বন্ধু এই পরিচয় দিয়ে সে লাল নীল সোনালী রঙের বিচিত্র লতাপাতায় চিত্রিত টিস্যু কাগজে এক আধুনিক গদ্য কবিতা ছাপিয়ে বিতরণ করলো, এবাব নব কুমাবসম্ভবেব সূচনা ইত্যাদি।

মাতালু এবং তার পরিবাব উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলো কিন্তু যোগ দেয় নি।

আর মালতীর সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিলো, এইবাব সেই ফিট-টা হবে আর সব কিছু পণ্ড হবে।

॥ চৌদ্দ ॥

জলপরীদের কথা মনে থাকবার নয় মাতালুর, মনে ছিলোও না। তার উপরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জলপরীদের বাসা ভেঙে যায়, তারা বাতাসে মিলিয়ে যায়। এ-ক্ষেত্রেও তেমনি হয়েছে। জলপরীদের বাসা যেখানে ছিলো সেখানে এখন বাঁধ তৈরি হয়েছে। সেই বাঁধের উপর দিয়ে সারাদিন ব্যস্ত সমস্ত মিস্ত্রি মজুররা যাওয়া আসা করে। বিকেলে শহরের ভদ্র ব্যক্তিরা বেড়াতে বেরোয়।

অপরিচিত লোককেও বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে দেখলে অনেক সময়ে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তার মুখের আদরা মনের উপরে রেখা ফেলে যায়। অনেকদিন পরে সেই ভঙ্গিতে কাউকে দেখলে পুরনো কোন কথা মনে প'ড়ে যায়। এ-ক্ষেত্রে তরল অজস্র হাসিটার সুর মাতালুর স্মৃতিকে সাহায্য করলো। এত প্রচুর আনন্দ কি মানুষ করতে পারে?

মাতালু আর এক সন্ধ্যায় সেই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিলো। নতুন ঘরগুলির কোন কোন বারান্দায় দু-একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের সেই হাস্যময়ী স্ত্রীলোকটিকে আজ দেখা গেল না, কিন্তু মাতালু বাড়িগুলোর সীমা পার হ'য়ে যাওয়ার আগেই আর একজন তাকে ডাকলো হাতের ইশারায়। মাতালুর মনে হ'লো এই স্ত্রীলোকটিকেই সে অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলো।

সে এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটির সম্মুখে দাঁড়ালো।

'কি কন ?'

স্ত্রীলোকটি কিছু বললো না, কেমন অদ্ভুত করে যেন হাসলো। তার ভ্রূ দু'টি যেন একটু ওঠানামা করলো।

মাতালু বললো, 'কিছু কইবার চান ?'

স্ত্রীলোকটি পিছিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকলো এবং মাতালু ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

কমলার বয়সের হিসাব কেউ স্নেহের দৃষ্টিতে যাচাই করে না। তা করলে লোকে বুঝতে পারত তার বয়স ত্রিশ পার হ'লেও চল্লিশের কাছাকাছি যায় নি, যে বয়সে স্ত্রীলোকরা স্বামী পুত্রাদি নিয়ে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে বিরাজ করে। বর্তমানের নিরিখে কমলার সেই বয়স যাতে গ্রাহকদের মধ্যে থেকে তরুণতররা স'রে যেতে সুরু করে। তার দেহে যৌবন থাকবার কথা নয়, কিন্তু তার গড়নে এক ধরনের স্থিতিশীল আকর্ষণ এখনও আছে যা তার স্থূলতার মধ্যে একেবারে ডুবে যায় নি। গায়ের রং অত্যন্ত ফরসা, সেই হাস্যময়ী মেয়েটির তুলনায় তো বটেই। অসুখে ভুগে সে রক্তহীন হয়েছে, সে জন্যে তাকে প্রায় মোমের তৈরী ব'লে মনে হচ্ছে। মুখে অবশ্য মেছেতার দাগ আছে।

ঘরের মধ্যে একখানি মাত্র বেতের চেয়ার। তাতে মাতালুকে বসিয়ে কমলা একটা ছোট আলমারি থেকে সিগারেট দেশলাই এনে মাতালুর সামনে ধরলো।

'না খাইম।'

মাতালু সিগারেট নিলো না। কমলা তখন তার মুখোমুখি বিছানায় বসলো।

'বাড়ি কোথায় আপনার ?'

'দুখিয়ার কুঠি।'

আলাপ জমলো না। কমলা উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা একটু কমিয়ে দিলো। বিছানায় ব'সে অদ্ভুত ক'রে হাসলো। একটা বালিশ কুড়িয়ে কোলে নিয়ে সেটাকে টিপে পিষে খেলা করতে লাগলো। তারপর কি মনে ক'রে বালিশ চারটের ওয়াড় খুলে ফেললো, বিছানাব চাদর তুলে ফেললো। আলমারি থেকে নতুন ধোয়া চাদর বালিশের ওয়াড় বার করলো।

মাতালু লক্ষ্য করলো বালিশের ওয়াড় পরাতে বিছানার চাদর পাততে কমলার হাত কাঁপছে।

মাতালু বললো. ছাড়ো, মুই ঠিক করি দ্যাও।'

বালিশের ওয়াড় পরিয়ে, বিছানার চাদর পেতে আবার চেয়ারে গিয়ে বসলো মাতাল। সে বললো, 'এলাও শরীর সারে নাই দেখঙ।'

কমলা যেন একটু বিস্মিতই হয়েছিলো, সে সময়-উপযোগী কথা খুঁজে পেলো না।

কিন্তু মাতালু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা রাত হয়, মুই যাইম।'

এবাব বিরক্ত বোধ হলো কমলার। সে বিরস মুখে বললো, 'তা হ'লেও টাকা দিতে হবে।'

টাকা?' মাতালু পকেট হাতড়ে চার পাঁচটা টাকা বার করে কমলার হাতে দিলো।

মাতালু চ'লে যেতে না-যেতেই কিন্তু কমলা বিমর্ষ হ'য়ে পড়লো। সে ভাবলো রাগের মাথায় চূড়ান্ত ভুলই সে ক'রে বসেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিনী শ্যামলী তিন চারদিন আগে একজনকে রসিকতা করার জন্য পাঠিয়েছিলো। অর্থ উপার্জনের অনেক আশ্বাস দেখিয়ে হাসি তামাসা ক'রে শেষে সে কমলার বয়সের দিকে ইঙ্গিত ক'রে চ'লে গিয়েছিলো। সেই মর্মান্তিক জ্বালা ভুলতে পারে নি কমলা। কিন্তু

যে অত সহজে টাকা বার ক'রে দেয় সে হয়তো শ্যামলীর পাঠানো কোন অতি-ইতর রসিক নয়। কমলার মনে হ'লো সে ছুটে গিয়ে মাতানুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। একেই বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা। আর কখনই কি মাতানু আসবে?

কমলা যে স্বভাবতই রূঢ়ভাষিণী তা নয়। কিছুদিন আগেও, তখনও বাঁধের জন্য উঠে আসতে হয় নি, শ্যামলী ও তার যৌথ সংসার ছিলো। উপার্জন যারই হ'ত যত স্বল্পই হ'ক সুখস্বাচ্ছন্দ্য তারা ভাগাভাগি ক'রে নিতো। এখানে আসবার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে একটা প্রভেদ দেখা দিয়েছিলো, ক্রমে তারা আহারাদির ব্যাপারেও পৃথক বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। এর জন্য কমলাই দায়ী, শ্যামলীর ভাষায় তার ঢং। ব্যবসাই যদি করবে তবে আর বাছ-বিচার কেন? শুধু ভদ্রলোকই আসবে? এর আগেও কি তাই আসতো? কমলা এ-সব যুক্তিকে অস্বীকার করে না। সে চেষ্টাও করেছে। কিন্তু মিস্ত্রি ড্রাইভারদের সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে নি। শ্যামলী বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, সারাদিনের ঘর্মাক্ত পরিশ্রমের গন্ধ যেন তাদের গায়ে লেগে থাকে। বিছানা সম্বন্ধে কমলা একটু পরিচ্ছন্ন, সেই বিছানায় বালিশে তেল কালির দাগ প'ড়ে যায়। আর এ বোধ হয় শ্যামলী কিছুতেই বুঝতে পারবে না। গ্রামবাসী কৃষকরা যে শ্রদ্ধার ও বিস্ময়ের ভাব নিয়ে আসতো, এই মিস্ত্রি-ড্রাইভারদের তা নেই। এরা যেন ঊর্ধ্বশ্বাস ক্রূরতারই উপাসক। রূঢ়তা ও কর্কশতাই এদের কাম্য। সদর থেকে শ্যামলীর ঘরের ও পাশে এসে যারা বসেছে, কি ক'রে ওরা সহর বৃদ্ধির সংবাদ পেলো, কে ওদের আনলো তাও বিস্ময়ের ব্যাপার, তাদের চেহারা ও রুচির সঙ্গেই বোধ হয় ওদের মেলে। এই সব ভাবতে ভাবতে কমলা শুকিয়ে উঠছিলো। তারপর তাকে ধরলো জ্বর। উপার্জন বন্ধ হ'য়ে গেলো। কমলার ব'সে ব'সে খাওয়া দেখে শ্যামলী চ'টে গিয়েছিলো। কমলাও রাগের

মাথায় তাকে দু-একটা কথা বলেছিলো, তারপর থেকেই সুরু হ'লো শ্যামলীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, প্রকাশ্য শত্রুতা।

মাতালু চ'লে গেলে যত ভাবলো কমলা ততই সে হায় হায় করতে লাগলো। মাতালুর ধীর-স্থির ভাব, তার বিছানা পেতে দেয়ার প্রস্তাবের মধ্যে একটু যেন স্নেহ কিংবা শ্রদ্ধার ইঙ্গিত ছিলো। তা থেকে কমলা বুঝতে পেরেছিলো মাতালু এ দিকের কোন গ্রামের অধিবাসী এবং হয়তো তার অর্থসঙ্গতিও আছে। কিন্তু আর কি আসবে ? সে কি তার বয়সটা বুঝবে না ?

কমলা নিজের বয়সটাকে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করলো না। নিজের বিশিষ্টতাটুকুকে শাণিত ক'রে তোলার চেষ্টা করতে লাগলো। চোখে কাজল দেয়া বন্ধ করলো, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙালো না। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ধূপ দিতে লাগলো, আর যে সামান্য দু'একগাছা স্বর্ণালঙ্কার তার অবশিষ্ট ছিলো তা বিক্রি ক'রে শয্যাটাকে আরও শুভ্র ক'রে তুললো। কিন্তু তার একথাও মনে ছিলো যে বয়স চল্লিশে এসে পৌঁছেছে, তার পক্ষে কমবয়সী কাউকে স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করা সম্ভব নয়।

চার পাঁচ দিনের চেষ্টার পরে সে পথে বেরিয়ে মাতালুকে ধরতে পেরেছিলো। রং ঢং না ক'রে পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে মাতালুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নীরবে কেঁদেছিলো, কান্না চাপতে পান না-খাওয়া পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিলো। কান্নাটার ফল দেখে সেটা বারনারীর অভিনয় ব'লেই মনে হয়, কিন্তু সেটা নকল নয়। কারণ কমলার তখন মনে হচ্ছিলো নিজের অসহায়তার কথা, শ্যামলীর বিদ্রূপের কথা।

কিন্তু বৃথাই সে বিশ বছর ধ'রে ব্যবসা করেনি। মাতালুকে যা ভেবেছিলো ঠিক তাই সে। নতুবা কেউ বারনারীর ঘরে এসে তার চুল খুলে নিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে! এর ফলে অবশ্য

কমলাকে চুলের যত্ন নিতে হচ্ছে।

তারিখের হিসাবে সেটা মালতীর বিয়ের রাত্রি। আগের দিন মাতালু বলেছিলো সে আসতে পারবে না, তার বন্ধুর বিয়ে আছে।

'তোমার আবার বন্ধু আছে নাকি কেউ আমি ছাড়া?' কমলা হাসি হাসি মুখে বলেছিলো।

মাতালু বলেছিলো, আছে, তার নাম মালতী, অনেক কষ্ট দিয়েছে নাকি সে।

কমলা মাতালু জন্য প্রতীক্ষায় ব'সে নেই, কিন্তু কখন সে এসে পড়বে তার স্থিরতাও নেই। কাজেই সে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছিলো। পাশের ঘরে দুপুরের পর থেকে যে বিচিত্র কোলাহল সুরু হয়েছে তা এখনও চলছে। কোলাহলকারী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়েছে নতুন নতুন গ্রাহক আসার সঙ্গে, কিন্তু মূঢ় ধ্বনিটা নানা কণ্ঠে যেন একই ভাবে উৎসারিত হচ্ছে।

এমন সময়ে কমলার দরজায় কে মৃদু আঘাত করলো। মাতালু মনে ক'রে উঠে বসলো সে। কিন্তু মাতালুই কি? এত রাত্রিতে কি সেই এসেছে?

কমলা দরজা খুলে হকচকিয়ে গেলো। সম্পূর্ণ অচেনা এক ভদ্র ব্যক্তি। কমলার মনে একটা দ্বিধা উপস্থিত হলো। কিন্তু লোকটি বহু অভিজ্ঞ। সে একখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে কমলার হাতে দিলো এবং বিছানায় এসে ব'সে বললো, 'আমি একটু ঘুমাব শুধু।'

লোকটি সারারাতে ঘুমালো কিনা সন্দেহ, বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। বিছানার একপাশে শুয়ে কমলাও ঘুমাতে পারলো না। লোকটার চাল-চলনে তারও অস্বস্তি বোধ হচ্ছিলো। চোর-ডাকাত নয় তো?

গিল্‌টির গহনাগুলোকে সোনা মনে ক'রে তার গলা টিপে না ধরে।

সোনার কথা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রার ঘোরে মনে পড়ছিলো মাতালু যে নাকফুলটা দিয়েছে সেটা সোনার, পাথরটাও খাঁটি। কিন্তু নাকফুল নিয়ে কে আর টানাটানি করবে। পাথরটার রংটা অবশ্য ভারি সুন্দর. পায়রার ডিমের মতো নীলের আভাস আছে তাতে।

লোকটা পাশ ফিরতেই তার কনুই-এর খোঁচা লাগলো কমলার গায়ে। তন্দ্রাটা টুটে গেলো তার।

কমলা তন্দ্রার ঘোরে যা ভাবছিলো তা মনে পড়লো তার। দু'একদিন আগে মাতালু কি একটা বলতে গিয়ে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠছিলো। কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারেনি, কিন্তু কমলা বুঝতে পেরেছিলো তার বক্তব্যটার কোথায় সন্তান, ছেলে-পুলে লুকিয়ে ছিলো।

কমলা আবার পাশ ফিরলো ঘুমানোর জন্য। যেন রক্ষা করার অর্ধজাগ্রত একটা বৃত্তি থেকে তার একখানা হাত নাকফুলটার কাছে রইলো।

সে ভাবলো এমন অপরিচিত ভিনদেশী লোক কোথা থেকে এলো এই শহরে? দশটা টাকা দিয়েছে। কমলা জানতো না অবশ্য ঠিক এমনি একটি ফুল আছে মালতীর নাকে। সেটা বেশী কথা নয়, পছন্দ করার সময়ে মাতালুও বুঝতে পারে নি দোকানী এটাকে দেখানো মাত্রই কেন তার মনে হয়েছিলো—এটাকেই সে খুঁজছিলো।

॥ পনেরো ॥

কথাটা বোধ হয় সিঁদুর। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা। বাড়িটার দরজা-জানালার পর্দাগুলোয় লালের আভাস। মালতীর হাতে লাল শাঁখা। তার সর্বাঙ্গের অজস্র নতুন গহনাগুলিতেও যেন লালের আভা।

অবাক লাগবার মতো কথা হ'লেও সত্যি ব'লে মনে হয়, কালো মেয়ে মালতীর গালে একটা লাল আভা দেখা দিয়েছে। এ দু'মাসে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে।

লখাই চক্রবর্তীর বাড়িটাই শুধু নতুন কায়দায় তৈরী নয়, সুপ্রচুর আসবাব ঘরে ঘরে। সে সবও আধুনিক ছাঁদে গড়া। মালতী সে সবের নাম জানে না, এমন কি লখাই চক্রবর্তীও না। সদর থেকে দু-তিনটে ট্রাকে বোঝাই হ'য়ে এসেছে সেগুলি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। সেগুলিকে ঠিক গুছিয়ে রাখা হয় নি।

বাড়িতে লোকজন নেই। ঝি থাকে একজন ভোর সকাল থেকে রাত আট-টা ন'টা অবধি। লখাই চক্রবর্তী চা-বিস্কুট-ডিমে প্রাতরাশ শেষ ক'রে বেরিয়ে যায়, দুপুরে ফিরে আহার ক'রে বিশ্রাম করে কিছুক্ষণ, তারপর আবার কাজে যায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

ভোর সকালে উঠে স্নান করে প্রাতরাশের যোগাড় করে মালতী। লখাই বেরিয়ে গেলে নতুন রান্নাঘরে নতুন ঝকঝকে বাসনপত্র নিয়ে রিনিঠিনি চুড়ি বাজিয়ে রান্না করে সে।

অবসর সময়ে সে ঘরগুলিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এতগুলো ঘর নিয়ে কি করবে সে খুঁজে পায় না, কিন্তু ঘরগুলোকে হাতছাড়া করতেও ইচ্ছা নেই তার। লাল রং করা ঝকঝকে মেঝে, সাদা ঝকঝকে দেয়াল। মালতী কোন জানালার পর্দা ঠিক ক'রে দেয়, কোন টেবিলের ঢাকনা থেকে পালকের ঝাড়ন দিয়ে আলগা ধূলো ঝেড়ে ফেলে।

আর এ কি অদ্ভুত প্রমত্ত নেশা যা সকালের স্নানেও কাটে না। সারাদিন যেন তারই বিহ্বলতায় কেটে যায়। অন্ধ-করা, অন্ধ একটা উল্লাস। দেহ, দেহ, দেহ।

তুখিয়ার কুঠিতে যায় নি মালতী। লখাই তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না; ভাইরাও নিতে চায় নি। সেখানে গেলে নাকি তার পুরনো অসুখটা ফিরে আসতে পারে। মা বলেছেন আনতেই তো হবে—হয় নি এখনো কিছু, হবে তো। তখন আনলে হবে, বরং সময়ের অনেক আগেই আনা যাবে।

বই পড়বে মালতী? অনেক বই এসেছে সদর থেকে। গ্রামোফোন চাই? সে তো আলমারিতেই আছে, আর আলমারির চাবির গোছা বাঁধা মালতীর আঁচলে।

আকস্মিকভাবে মালতীর একদিন মনে পড়লো মেজদাদা নেই। বাইরের দিকের একটা জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো সে, যেন দৃষ্টিটাকে বাইরে পাঠাতে চায়, ঠিক তখনই যেন অনিবার্যভাবে লখাইকে দেখা গেলো। চোখাচোখি হ'লো। দৃষ্টিটা ফিরে এলো রঙিন স্বচ্ছ ছিটের পর্দায় ঘেরা ঘরের মধ্যে।

লখাই কনট্রাক্টর, সে ব্যবসাদারও। তার কুলিরা এখন শহরের মধ্যে দুটি প্রধান পথ বাঁধানোর কাজে ব্যস্ত। ব্রিজের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। আগামী মাসের প্রথম দিকেই ওপারের নতুন তৈরী রাস্তার সঙ্গে এপারের নতুন তৈরী সড়কের যোগাযোগ হবে।

তারপর আরও অনেক নতুন তৈরী রাস্তার জন্য মিস্ত্রি-মজুররা নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে চলবে। ওপারের প্রায় পনর মাইল পথের মাটি কাটার কনট্রাক্টি ইতিমধ্যে সে পেয়েছে। শহরের পথগুলো তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে। একসঙ্গে দেড়শ' দু'শ' মাইলের কনট্রাক্টি এরা কিছুতেই দেবে না। তা নাকি কোন একজন কনট্রাক্টারকে দেয়া নিষেধ। তা হ'লে এই উদ্বেগ থাকতো না লখাই-এর। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে লখাই শুধু বলে —দেখা যাক। তারা তো জানে না লখাই-এর শুধু দৃঢ় স্বাস্থ্যই নেই দেহে, তার এই চল্লিশ বৎসরের মনে আছে দুঃসাহস এবং অসীম উৎসাহ।

একদিন লখাই প্রাতরাশের পরে বেরুলো না, তার বৈঠকখানায় একজন ছুতোর মিস্ত্রিকে নিয়ে আগের দিন সন্ধ্যায় আসা বড়ো বড়ো দু'টি প্যাকিং কেস খোলার বন্দোবস্ত করছিলো। শব্দ পেয়ে ঝিকে জিজ্ঞাসা করেছিলো মালতী, 'বাইরের ঘরে কে, তোমাদের বাবু ?'

ঝি দেখে এসে বলেছিলো তাই বটে। এবং কৌতূহল থেকে মালতী বৈঠকখানা ও অন্দরের মাঝখানের দরজায় ঝোলানো পর্দার এপারে দাঁড়িয়েছিলো। লখাই আলতা রাঙানো দু'খানা পা এবং শাড়ির আঁচলের খানিকটা দেখতে পেয়েছিলো। সে উঠে এসে আদর করলো স্ত্রীকে। তারপরে বললো, 'আজ বেরুব না, এস না বাইরের ঘরে।'

'অন্য কেউ যেন আছে।'

'থাকলই বা। কর্মচারীরা জানবে না তাদের রাণী কে ?'

মালতী গিয়ে দেখেছিলো বৈঠকখানার ঝকঝকে টেবিলে, ঝকঝকে মেঝেয় খড়ের কুচি জড়ানো নানা আকারের ঝকঝকে সব বোতল। মিস্ত্রি প্যাকিং বাক্স খুলছে আর লখাই নিজের হাতে সযত্নে বোতল-গুলিকে বার ক'রে সাজাচ্ছে আকার ও বর্ণ অনুসারে। মালতী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

বাক্স খোলা শেষ ক'রে মিস্ত্রি চ'লে গেলো। লখাই ততক্ষণে বোতলগুলো সাজিয়ে গুনে ফেলেছে, তারপরে সে কোঁচার খোঁট দিয়ে ঝাড়তে লাগলো বোতলের গায়ের খড়ের কুচিগুলো। তা দেখে মালতীও এগিয়ে গেলো এবং আঁচল দিয়ে ঝাড়া বোতলগুলো মুছতে লাগলো। পরস্পরের সান্নিধ্য কাজটাকে একটা খেলার সামিল ক'রে দিলো।

এক সময়ে মালতী বললো, 'কি এগুলো, ওষুধ?'

লখাই-এর চোখে কৌতুক বোধ নেচে উঠলো। সে এক মুহূর্ত যেন কথাটাকে নিয়ে কিভাবে খেলা করা যায় তাই ভাবলো।

'ভালবাসা কাকে বলে জানো? এগুলো ভালবাসার জিনিস।'

'ভালবাসা?'

'কারো কারো কাছে স্ত্রীর চাইতে এর মূল্য বেশী।'

'নেশা?'

'বিলেতি মদ। স্ত্রীর গহনা কেড়ে নিয়েও এই মদ কেনে লোকে।'

'সত্যি?'

মালতীর হাতে একটা বোতল ছিলো। সে অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে রইলো, যেন তার মধ্যে কোন অদ্ভুত শক্তিকে সে দেখতে পাবে, একবার রাসের মেলায় তেলের বয়ামের মধ্যে যেমন পেল্লায় একটা মাকড়সা দেখেছিলো। তার গা শিরশির ক'রে উঠলো এবং দৃশ্যতই সে কেঁপে উঠলো।

সে বললো, 'কি হবে এত?'

তার সত্যিকারের প্রশ্নটা ছিলো: তুমিও খাও নাকি?

লখাই মিটমিট ক'রে হাসলো, যে-কথাটা যে-ভাবে উচ্চারিত হ'তে যাচ্ছে তার সমীচীনতাই যেন সে যাচাই করলো মনে মনে।

সে বললো, 'শালাদের জন্যে এনেছি।'

মালতী চমকে উঠলো। তারপরে নিঃশব্দে হাসবার চেষ্টা করলো।

'তোমার ভাইবা নয়, তারা ছাড়াও আমার অনেক শালা আছে।'

এ বকম ধরনেব কথা এই প্রথম শুনলো মালতী লখাই-এর মুখে, বিব্রত বোধ. করতে লাগলো সে। পক্ষান্তবে লখাই যেন একটা স্বাধীনতা পেলো। বিযেব আগে সে শুনেছিলো মালতী অত্যন্ত মার্জিত রুচির মেয়ে। তার ফলে অত্যন্ত মেপে মেপে চলেছে সে এতদিন। কথায় ও ব্যবহাবে একটা মার্জিত ভাব বজায় বেখেছিলো। সেও একটা খেলা। বিয়েব আগে এই ঘবগুলোর মধ্যে লুঙ্গি পরে কত ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু এখন তাব পবণে সব সময়ে ফরাসডাঙ্গার কোঁচানো ধুতি। ভালোই লাগে। কিন্তু তা হ'লেও যেন তা কৃত্রিমতায় আড়ষ্ট। এইমাত্র সে যেন সেই কৃত্রিমতাব গুটি কেটে বেরুলো এবং অনুভব কবলো তার এবং মালতীব পক্ষে দুঃসহ হ'লো না তা। মালতী লোপ পেয়ে গেলো না, তেমনি কামনারূপা হ'য়েই দাঁড়িয়ে রইলো। লখাই এর পরে তার স্বাভাবিক ভাষায বকবক করতে লাগলো। দোকানের কথা, এঞ্জিনীয়ার প্রমুখদের মদের বোতল ভেট দেয়ার কথা।

কথার মাঝখানে লখাই একটু আদরও ক'রে নিলো মালতীকে। মালতীর মনে হ'লো এ কোন ধুলোয় জড়ানো লখাই, যার পারুষ্যকে শঙ্কা করতে হয। এবং যাব প্রাবল্যে নতুনতব অভিজ্ঞতা থাকতে পাবে।

লখাই নেশা করে না। অন্তত মালতী আজ পর্যন্ত তাকে বিহ্বল অবস্থায় দেখে নি। কিন্তু সে নেশার দোকানদার। আগে গাঁজা আফিম আর দিশি মদ ছিলো—এখন থেকে বিলেতি মদও থাকবে। বিয়ের আগেই সে যা শুনেছিলো তাতে আন্দাজ করতে

পেরেছিলো লখাই-এর ব্যবসায়ের মধ্যে নেশার দোকানটাকেও ধরতে হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় অন্য ব্যাপার।

বোতলগুলোর মধ্যে একটির কথাই বিশেষ ক'রে তার মনে আছে। সোনা যদি স্বচ্ছ হয় ঠিক তেমনি বোতলটা। কিন্তু শুধু একটাই নয়, প্রত্যেকটি বোতলই ; কি সুন্দর গঠন, কি নিখুঁত সুন্দর ছাপা, কি পটুতা সেই ছবিগুলোতে যা বোতলের গায়ে আঁকা ছিলো, কি পরিপাটি ক'রে মুখ আটকানো ! মানুষ সভ্যতার ও কৃষ্টির পথে অনেকদূর এগিয়ে না-গেলে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কিছু করতে পারে না।

কিন্তু নেশা। আকস্মিকভাবে সেই বেদনাটা জেগে উঠলো : যে ব্যথা নিয়তই তার নীরব অস্পষ্ট অনুভূতি দিয়ে তার হাসিকে করেছে অচপল, তার দৃষ্টিকে করেছে ধীর, যে মুহ্যমানতা থেকে উঠে পড়বার আগ্রহে লখাইকে সে কখনো কখনো আঁকড়ে ধরতে গিয়েছে।

ফিট আর তার হবে না। সে বয়ীয়সীদের আলাপ থেকে এটা বুঝতে পেরেছে লখাই-এর স্পর্শই নাকি তার সে ব্যাধি নিরাময় ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মেজদাদা ? মেজদাদা। মালতী ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ালো। যেন সে কোথাও যেতে চায়। সংসারজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধি তাকে বাধা দিলো। সে জানালার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিকে প্রেরণ করলো কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নয়, বাইরে। তার মনে হ'তে লাগলো, হয়তো তার ফিট হবে, এখনই হবে। এবং যেহেতু সেটাও একটা ব্যাধি, সেটা লখাই-এর মনে ঘৃণা এনে দিতে পারে।

এ মনোভাব থেকে স'রে যাবার চেষ্টা ক'রে কখন কখন সফল হ'তো সে, কিন্তু অন্য কোন কোন সময়ে এটাই তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতো। বিশেষ ক'রে লখাই আজকাল কখন কখন প্রাতরাশের পরে বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন অনুপস্থিত থেকে রাত্রিতে

ফিরে আসে। দীর্ঘ দিনমান উঠে ব'সে দিন যায় মালতীব।

সেই একদিন হঠাৎ গ্রাম্য স্বাভাবিক স্বুরে কথা ব'লে ফেলার পর থেকে লখাই যেমন তার স্বাভাবিক ভাষায় ও চালচলনে ফিরে আসছে ক্রমশঃ, মালতীর ক্ষেত্রেও যেন তেমনি হ'লো। লখাই যেমন চেষ্টা করে মার্জিত রূপটা তুলে ধরেছিলো, মালতীও তেমনি কিছু কবেছিলো। আচরণেব দিক দিয়ে স্বভাবতই মালতী মার্জিত ছিলো। মালতীর ক্ষেত্রে সেটা আত্মবিস্মৃতা হবাব চেষ্টা যেন ছিলো, ছিলো লখাইকে স্বুখী করার প্রযাস, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা নতুন একটা অবস্থায়। মালতীও যেন কিছুটা স্বভাবে ফিরে আসছে।

নেশা। মেজদাদা নেশা করতো। ওষুধ নয়, নেশা। একটা বিদ্রূপের মতোই শোনায়। আফিম খাওযাব অর্ধসভ্য নেশা না ক'রে মরফিয়া নিতো ইনজেকশনে। মৃত্যুর পর এ-সবই প্রকাশ পেয়েছে। তার মৃত্যু সম্বন্ধে লোকে কানাকানি কবছে আত্মহত্যা নয় সেটা, অত্যাধিক নেশা করাব ফল। মালতী জানে মেজদাদা এই নেশায় জড়িয়ে পড়ে কি আত্মগ্লানিই না ভোগ করেছে, যন্ত্রণায় বিবশ দিন কেটেছে তার। চোখ বেয়ে টসটস ক'রে জল পড়তো মালতীর হয়তো খানিকটা স্বুস্থ হ'তে পারতো সে। কিন্তু কান্নার উৎসও রোধ ক'বে দেয়াব মতো যেন একটা বিপরীত প্রবৃত্তিও জেগে ওঠে মনে। মেজদাদাকে শ্রদ্ধা করতে সে পারে না, যাকে শ্রদ্ধায় ভালবাসায় আদর্শের আসনে বসিয়েছিলো তাব জন্য শোক করতে গিয়েও ছি-ছি ক'রে ওঠে মনের এক অংশ। আচ্ছা মেজদাদা, নেশাই যদি করবে তবে তা প্রচুর পরিমাণে আনিয়ে রাখলেই পারতে, কেন আমাকে মাতালুব কাছে যেতে বলতে। তুমি কি বুঝতে না কেন সে আমার কথা শুনতো। আমি তার সামনে একটা নীরব প্রতিশ্রুতির মতোই দাঁড়াতাম। অথচ মেজদাদা নেই;

এ ভাবতেও বুক ফেটে যায়। মালতী জানলার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। যেন কাউকে দেখবে বা খুঁজবে।

একদিন ঠিক এ-রকম মন নিয়ে যখন সে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেখতে পেলো মাতালু যাচ্ছে তার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে। তখন বিকেল। মাতালু যেভাবে চলছে তাতে ঠিক জানলার নিচে দিয়েই তার যাবার কথা। পর্দাটাও যেন না দুলে ওঠে এমনিভাবে নিঃশব্দে নিঃসাড়ে স'রে এলো মালতী। কিন্তু এর পরে দু-একটা বিকেলে মাতালুকে যেতে দেখলো মালতী সেই পথেই। সময়ের দিক দিয়ে কিছু আগে পরে, কিন্তু রাস্তাটার যে পারে মালতীর বাড়ী সে পার ঘেঁষেই সে চলে। যেন সেটাই তার অভ্যাস।

দু'এক সপ্তাহের মধ্যে মালতী সে জানলায় যায় নি। মাতালু তার অভ্যাস বদলেছে কি না কে জানে। লখাই-এর অভ্যাস বদলেছে। ব্রিজের ওপারের কাজ দেখা শোনা করার জন্য রোজ রোজ বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করা তার সম্ভব নয়। তাঁবু পড়েছে সেখানে। কোন কোন রাত্রিতে বাড়িতে না ফিরে সেখানেই থাকে সে।

এমনি একটি রাত্রিতে ঘুম আসছিলো না মালতীর। ওদিকের একটা ঘরে ঝি ঘুমে অচেতন এরই মধ্যে। দূরে বৈঠকখানার বারান্দায় একজন চাকর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

বই হাতে খানিকটা সময় ব'সে শুয়ে কাটিয়ে মালতী রাস্তার ধারের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। কি ভাগ্য তার। সভ্যতার সবটুকুই গরল নয়, অথচ তার ভাগ্যে সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'লো গরল দিয়ে। সে গরলে বুক জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে। কোনদিনই কি মেজদাদাকে ভোলা যাবে!

মাতালু? মাতালু নাকি? বারে, মাতালু। বেশ দেখায় তো তোমাকে ড্রাইভারদের মতো প্যান্টের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে-দেয়া সার্ট

পরলে। এত রাত্রিতে এদিকে কেনই বা এসেছ? কথাগুলো মনের নিভৃতে উচ্চারণ ক'রে স'রে যেতে গিয়ে পর্দাটা দুলে উঠলো, জানলার ব্যাংটাতে খট্ ক'রে শব্দ হ'লো। পর্দার গায়ে চোখ লাগিয়ে মালতী দেখতে পেলো মাতালু শব্দে আকৃষ্ট হ'য়ে মুখ তুলে চেয়ে বোধ হয় কিছু বুঝতে না-পেরে চ'লে গেলো।

সেদিন লখাই বিকেলে এসেছিলো। ব'লে গেছে দু'দিন ফিরতে পারবে না। মালতীর মনে হ'লো সে বলে,—একা একা থাকতে ভালো লাগে না কিন্তু সেটা যেন হ্যাংলামির মতো শোনাবে, এই ভাবলো সে। সে বললো,' শরীরের অযত্ন ক'রো না।'

আজও ঘুম হ'লো না মালতীর। পায়ে পায়ে সে একবার বৈঠকখানায় গিয়েছিলো। সেখান থেকে সবগুলি বোতল এখন স'রে যায় নি। সেই অদ্ভুত অনুভূতির স্মৃতি এলো মালতীর মনে, আরকে ভিজিয়ে-রাখা রাক্ষুসে মাকড়সার কথা মনে হয়েছিলো তার আর একদিন। একটা মোহের মতো কিছু যেন বিকীরণ করতে পারে সেই বোতলগুলি। দেখতে-দেখতে মালতী অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সেখান থেকে স'রে এসে মালতীর মনে হ'লো কি একটা যেন গলতি আছে তার জীবনে যে জন্য তার হৃদয়ের একটা অংশ কিছুতেই পূর্ণ হয় না। মেজদাদার কথা মনে হলোনা, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট বিষাদ হৃদয়ের সেই ফাঁকা জায়গাটায় থেকে থেকে সে অনুভব করতে লাগলো।

রাস্তার দিকের সেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। এত রাতে পথিকদের চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। কে একজন তবু আসছে, চটির ফটফট শব্দ হচ্ছে। পর্দা আর জানালার ব্যবধানে একটা চোখ রেখে সে দেখলো মাতালু আসছে। মাতালু!

যেন এটা তার ভাগ্য, এই দেখা হওয়া। যেন আজ সারাদিন ধ'রে তিলে তিলে সে এদিকেই এগিয়েছে। মালতী পর্দাটা একপাশ থেকে

খানিকটা সরিয়ে দিয়ে গরাদের উপরে মাথাটা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'মাতালু ?'

'মালতী ? ঘুমাও নাই।'

'না। তুমি কোথায় যাচ্ছ ?'

'হুখিয়ার কুঠি।'

মালতী কি যেন বলতে গেলো কিন্তু আকস্মিক একটা দমকা হাসিতে কথাটা তলিয়ে গেলো। তারপরই অবশ্য সে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো।

মাতালু বিস্মিত হ'য়ে বললো, হাসো !'

'এসো না গল্প করি। বিয়ের দিন কেন তুমি যাও নি ? ভেবেছিলাম ব'লে আসব, রাগ ক'রো না'

মাতালু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো মালতীর দিকে। শুধু পোশাক পরিচ্ছদে নয় দেহের দিক দিয়েও পরিবর্তন হয়েছে মালতীর। গায়েব রং আগের চাইতে পরিষ্কার হয়েছে, গঠনও যেন পরিপূর্ণ হয়েছে। মাতালু চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলো।

মালতী বললো, 'অনেকদিন ভেবেছি তোমার সঙ্গে ব'সে খানিকটা গল্প করি। আচ্ছা দাঁড়াও।'

রাস্তার দিকে ঘরের একটা দরজা ছিলো, তার গোড়ায় সিঁড়ি ছিলো না। এ ঘরে বাস করছে মালতী, কিন্তু সেই দরজা আজ এই প্রথম খুললো।

'এসো।'

অবাক করা এই অভিজ্ঞতা। মূর্চ্ছার দুর্নিবার আক্রমণের মতো একটা অন্ধ আগ্রহই তাকে পর্দা সরিয়ে দিতে ইঙ্গিত করেছিলো। সান্নিধ্যের বাস্তববোধে সে মোহ কিছুটা টুটে যাওয়ার মতো হ'লো পদশব্দে যেমন নির্জনতা টুটে যায়, কিন্তু এ যেন খেলার মতো কিছু কিংবা ঘরের বাইরে হঠাৎ পা দিয়ে পথের বিস্ময়ের টানে টানে আরও

বিস্ময়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

মাতালুকে একটা চেয়ারে বসতে ব'লে মালতী ড্রেসিং টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কি বলবে সে খুঁজে পেলোনা। একটা অপরিণামদর্শী বাস্তবজ্ঞান তাকে ঘরের মৃদু আলোটার দিকে ঠেলে দিলো। আলোটা নিভিয়ে দিলো সে। যে চাঁদের আলোয় জানলার বাইরের মাতালুকে সে চিনতে পেরেছিলো সে আলোটাতেই অস্পষ্টভাবে মাতালুকে দেখা যাচ্ছে।

'আমি বড়ো বোকা, মাতালু, আলোটা নিভিয়ে দিলাম। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে, তুখিয়ার কুঠিতে ?'

'হ্যাঁ।'

'ভালো। আচ্ছা, মাতালু, একটা কথা সত্যি ক'রে বলবে—তুমি আমার কথা শুনতে কেন ? ভালবাসতে ?'

'মালতী।' মাতালুর বুক ওঠা পড়া করছে।

আশ্চর্য, আশ্চর্য। মনের মধ্যে যেমন কখন কখন আলো পড়েছে ব'লে মনে হয়, অন্য কখন যেমন সেখানে অন্ধকার অনুভব হয়, মালতীর মনের মধ্যে আজ যেন একটা তেমনি ম্লান আলোকের হট্টগোলের সভা। কে যেন খুব জোরে বলছে—সতী, সতী। কি বিরক্তিকর! কি অন্যায় সে করছে ? এই ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত এক জান্তব সাহস জেগে উঠে লাগলো মালতীর মনে। যেন তা মাতালুর প্রেমকে যাচাই ক'রে দেখবে।

রাস্তা দিয়ে শব্দ ক'রে একটা ট্রাক গেলো। যেন ধরা প'ড়ে গেছে এমনি ভাবে চমকে উঠলো মালতী।

আবার একটা দুর্বার হাসির মতো কিছু উঠে আসছে এই অনুভব করলো মালতী, কিন্তু সে সামলেও নিলো নিজেকে। মাতালুর সামনে এসে দাঁড়ালো সে, ফিস ফিস ক'রে বললো, - 'তোমরা সব পুরুষরাই এত মিথ্যা বলো কেন ? মেজদাদাও মিথ্যা বলতো, আর

জানো মেজদাদা শেষ নেশা করেছিলো আফিম দিয়ে, মরফিয়া তো সভ্যতার জিনিস, এ গ্রাম্য শহরে পাওয়া যায় না। আর সে আফিম সে কিনেছিলো আমার স্বামীর দোকান থেকে। কিন্তু তোমরা এত মিথ্যা বলো কেন ?'

মাতালু কিছু না ব'লে মালতীর কাঁধের উপরে একটা হাত রাখলো। সহসা যেন ভেঙ্গে পড়লো মালতী। সব কথা হারিয়ে সে মনে মনে কেঁদে যেতে লাগলো, ওরে, ওরে মাতালু।

আর বহুদিন পরে, তার মেজদাদার মৃত্যুর পরে এই যেন প্রথম দুর্বার অশ্রু নামলো তার গাল বেয়ে।

অনেকক্ষণ ধ'রে মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো মাতালু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি দুয়ার দাও মালতী, মুই যাইম এলা।'

মালতীও উঠে দাঁড়ালো।

মাতালু রাস্তায় নেমে দাঁড়ালে মালতী বললো, 'মাতালু আবার কখন যদি সুযোগ হয় দেখা ক'রো আমার সঙ্গে। যখন খুশি তখনই এসো। এসো, কেমন ? এসো কিন্তু। এসো।'

মালতী দরজা বন্ধ ক'রে এসে আলো জ্বাললো। চোখে মুখে জল দিলো। মশারী ফেলে শুতে গিয়ে পাশের জোড়া বালিশে চোখ পড়লো। লখাই-এর বালিশ। তার উপরে হাত রেখে মালতী ঘুমিয়ে পড়লো।

॥ ষোল ॥

ঠিক সাত দিন হ'লো। মাতালু আসে নি। একটু চিন্তা করতে হ'লো কমলাকে। অসুখ-বিসুখ করলো নাকি? সে জানতে পেরেছে তুখিয়ার কুঠিতে মাতালু ধনীর বাড়ি, কিন্তু খবর নেবার কোন উপায় নেই। খবর নিলে উল্টো ফল হ'তে পারে, কলঙ্ক কেলেঙ্কারির রটনা হবে। মাতালু হয়তো আর এ-পথে কোনদিনই আসবে না।

কিছু দিন আগে মাতালু তার অতীত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলো। কমলা বলেছিলো: বাজারের ঠোঙায় অনেক সময়ে কোন্ বই-এর একখানা পাতা দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে বইটার প্রথম বা শেষ কিছুই বোঝা যায় না। আমাদের জীবনও তেমনি।

মাতালু তার বক্তব্যটাকে ধরতে পারলো, কিন্তু তার কৌতূহলের নিরসন হ'লো না। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে তার মুখের ভাষার পরিবর্তন হচ্ছে। বলেছিলো, 'কমলা, শেষে তুমি কোথায় যাবে? আমার টে থাকি যাবে?'

এ-সব ধরনের আলাপে একটা অসুবিধা আছে। কারণ নানা রকম লোকের নানা ধরনের কথায় সায় দেয়া নয় এটা। মাতালুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলে বোঝা যায় সেই শান্ত দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের আশ্বাস আছে। এরই ফলে অনেক সময় কমলাকে ভাবতে হয়।

কমলার জীবনকে যদি একটা তথ্য হিসাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা

যায় তবে তার থেকে এই অনুমান হবে—পুরুষকে বাঁধতে পারে সমাজের শাসন, প্রেম নয়। অথচ তারাই সমাজের বাইরে বনারণ্যে প্রেমকে নিয়ে কুটীর তুলবার প্রলোভন দেখায়। এবং তারা নিজেরাই বোধ হয় নিজের স্বরূপ জানে না, নিজেরাও সেই কাহিনীতে প্রলুব্ধ হয়।

গদাধরপুর তখন ছিলো সমাজের বাইরে, ঠিক বনারণ্য নয়; বন এবং শহরের প্রান্তে কতকটা শাসনহীন দেশ। কারো মুখের দিকে চেয়েই বালবিধবা কমলা এখন থেকে প্রায় বিশ বছর আগে গদাধরপুরে এসেছিলো। একদা সমাজের শাসন পুলিশের চাইতেও তীব্র সন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের সেই কুটীরে তাদের আবিষ্কার করেছিলো। সমাজের শাসন এ-ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক কোন পার্শ্বচরের মতো হঠাৎ আক্রমণ করেছিলো, কারণ শাসনটা কমলা এবং সেই পুরুষটির মনের মধ্যেই লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ খুঁজছিলো। সেই পুরুষটির স্ত্রীপুত্রাদি ছিলো সদরের শহরে। তারা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠার আশ্বাস, তাদের নিঃশব্দ শাসন একদিন পুরুষটিকে বিচলিত ক'রে তুললো। আর কমলাও মনে মনে স্বীকার করলো, বিধবা সে, বয়স যতই কম হ'ক তার, এবং সে এ ক্ষেত্রে বিবাহিতা নয়। সাধারণ মেয়ে কমলা-প্রতিভাবানদের মতো নির্মম নিঃশঙ্ক হ'তে পারলো না। বদলির হুকুম হয়েছিলো পুরুষটির। কমলার পাশে শুয়ে সে ছটফট করছিলো, যেন সে ডুকরে কেঁদে উঠবে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকবে। কমলা বলেছিলো, 'তুমি যাও শহরে, আমার জন্যে ভেব না। আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসি না।' পুরুষটি চ'লে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপর কি করবে কমলা? কুলত্যাগিনী বিধবা সে, যদিও তখন সে আঠার উনিশ বছরের অবুঝ একটা মেয়ে বই কিছু নয়। আর সে একাও নয় যে গদাধরপুরের জলে সমস্যাগুলোকে ডুবিয়ে দেয়। সতীনের মেয়েকে সে বিয়ের রাতে বুকে ক'রে নিয়েছিলো;

তাকে নামাতে পারে নি বুক থেকে। সেই কুলত্যাগ করার রাত্রিতেও ঘুমিয়েছিলো সতীনের মেয়ে তার বুকেব কাছে। রুগ্না জননীর সন্তান, রাত্রিতে উঠে তাব খাওয়ার অভ্যাস। খাওয়ার সময় হয়েছিলো তার, থেকে থেকে কেঁদে উঠেছিলো ঘুমের ঘোবে। বাইবে এসে দাঁড়িয়েছে পুরুষটি। মেয়েটির একখানা হাত ছিলো কমলার গায়ের উপরে, কোমল রুগ্ন হাত। তাকে ফেলে পালিয়ে আসতে পাবে নি কমলা। আর পুরুষটি, সেই প্রথম, রাণীব মতো সমাদর করেছিলো কমলাকে। মেয়েটিকেও আদব কবেছিলো। এমনকি এখানে এসেও বলেছিলো—কমলা তোমার কোলে এই মেয়ে আছে ব'লেই তোমাকে এত ভালো লাগে।

সেই মেয়ে শ্যামলী। এখনও সে কমলার বুকের কাঁটা। তার কুৎসিত তিবস্কার ও কুৎসিতকব পরিহাসে অনেক জল পড়ে কমলার চোখ থেকে। তবু তার ঘরে কেউ রাগেব সুরে কথা বললে, মাতালের মতো চেঁচামিচি করলে তাব অমঙ্গলেব আশঙ্কায় এখনও কমলা ঘর বার করে।

কোন অভিযোগ আর নেই কমলাব। পদ্মার প্লাবনে ঘর ভেঙে গেলে যে মানুষ পদ্মার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে সে কি স্রোতের বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচনা কবে? নাকানি চোবানি খেয়ে তার প্রাণ আই-ঢাই করছে যখন তখন বাঁচবার একটা অন্ধ প্রয়াস ক্লান্তদেহকে আব ক্লান্ত না করাব একটা অবসন্ন ইচ্ছার সঙ্গে মিশে গিয়ে তার ভূত-ভবিষ্যৎকে একটা সংকীর্ণ বর্তমানে ধ'বে রাখে। কি করবে কমলা মানব সভ্যতার এই অগাধ স্রোতস্বান আবর্তে! দ্বিতীয়বাব সেটলমেণ্ট হওয়ার সময়ে সদর থেকে একটা সভ্যতার প্লাবন জোয়ারের মতো এ অঞ্চলে এসেছিলো। সে জল নেমে গেছে। ভেসে আসা ফুলও জোয়ার নামা কাদায় পড়ে থাকলে আবর্জনার মতো দেখায়। কমলাও তেমনি আছে। আর মাতালু? সে

মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তার সমাজের ভয় নেই। হয়তো ভয় দেখানোর মতো সমাজই নেই তাদের।

এমনি নিজের ভূত-ভবিষ্যতের কথাই ভাবছিলো আরও দু'জন। ডাঙ্গর আই এবং লখাই চক্রবর্তী।

মাতালুকে নিয়ে কোন চিন্তাই ছিলো না আই-এর। যখন সে শিশু ছিলো তখন ফুলমতী ছিলো পাশে। ছেলেকে মাটি ছুঁতে দিতে চায় নি। একটু বড়ো হ'লে রংবর আর তার ছেলে ফুলবর সব সময়ে দু'পাশে থেকে আগলে রেখেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আই-এর, নিজের জমি-জিরাতের দিকে নজর না রেখে আই-এর জমি-জমার রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে নিজের স্বাতন্ত্র্যই ভুলে গেছে রংবর-এর পরিবার। আই-এর মস্তবড় খামারের চাষ-আবাদের সঙ্গে চাষ হয় তাদের জমির। ফসলও ওঠে একসঙ্গে, এক গোলাতেই থাকে। প্রয়োজন মতো ব্যবহৃত হয়। ক্রীতদাসের মতো বলতে পারা যায় কিংবা অন্য দৃষ্টিতে একাত্মস্বজন। আইকে তারা শ্রদ্ধা করে এবং এত বেশী করে যে মনে হবে রংবর এবং তার পরিবারের অবস্থা সাধারণ ক্ষেতমজুরের চাইতেও নিম্নস্তরের, এত ভালবাসে তারা যে বোধ হয় রংবর আই-এর পিতার চাইতেও অধিক। আর এ সবই মাতালুকে কেন্দ্র ক'রে।

শরতের দুপুরের মতো কবোষ্ণ, তেমনি ধানের আশ্বাসে ভরা দিন সব। মাতালু স্বাস্থ্যবান হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে। তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ধানের জমি আছে। সে বে-হিসেবী নয়, বদমেজাজী নয়। আই-এর চোখে এর চাইতে ভালো আর কোন পরিবেশের কামনা নেই।

মালতীর ব্যাপার নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা করতে হবে এ-রকম আশঙ্কা হয়েছিলো এক সময়ে। ছেলের চোখে মুখে অশান্তির ছাপ

কখন কখন দেখা যেতো। ফুলমতীর কাছে মালতী একেবারে মূল্যহীন, আই ঠিক তেমনটা ভাবতে পারে নি। তার মনে হ'তো অন্য সব ব্যাপারে ছেলেকে সাহায্য করার চেষ্টা করা যায় কিন্তু মালতীর হৃদয় পরিবর্তন করার বিষয়ে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না তার।

কিন্তু শান্তিকে বিঘ্নিত করার মতো ব্যাপার ঘটালো রাজপথের অগ্রগতি। মাতালু ক্রোধে এবং উত্তেজনায় যেন পুড়ে যেতে লাগলো। আই এর তখন মনে হ'তো রাজধানীর লোকদের একটা কৌতুককর অভ্যাস আছে ঃ মনে করো সবগুলো লোক একই দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে চলেছে, হঠাৎ তাদের একজন কোন এক অজ্ঞাত কারণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠলো, যে পথে চলছিলো সে পথ ছেড়ে অন্যদিকে ঝুঁকলো। তারপর সেই নতুন পথেই আবার সকলে চলতে স্থুরু করলো। তেমনি একটা নতুন ধরনের ঝোঁক এসেছে রাজধানীর লোকদের মাথায়, তারই ফলে কালো নদীর মতো এক সড়ক। গদাধরপুরের ব্রিজের কথাও শুনেছে আই।

মালতীর বিয়ের কথা চলছে। মাতালুর মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখতে পায় আই। রোজ সে সব কথা মনে জাগে না, গভীর বেদনা অনুভব ক'রে তেমনি সব চিন্তার দিকেই আই মুখ ফিরিয়ে বসেছিলো। অদ্ভুত মানুষ এই ভাটিয়ারা। মালতীর প্রতি মাতালুর এই ভালবাসার কোন পরিণতি নেই, পরিণতির পথে বাধা হবে ভাটিয়াদেব জাতি-অভিমান। কোন যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না অথচ অভিমানটা আছেই। নানা উপাদানে গঠিত সেটা ঃ রূপের মিথ্যা বড়াই, জ্ঞানের বৃথা দম্ভ, ধর্মের বিকৃত ভান, এমনি আরও কত। কখন স্পষ্ট ভাবে কখন অস্পষ্ট ভাবে চোখে পড়েছে আই-এর। আসল কথা এই ঃ কোন একদিন কোন কুরুক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর বিজয়ী ভাটিয়ারা শক্তির এমন প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো যে তার বিরুদ্ধে

বাধা দেয়ার কথা আর চিন্তা করে নি আদিবাসীরা। তারা পালিয়েছিলো। ভাটিয়াদের বংশধরদের রক্তে এখন আর সেই শক্তি নেই, কিন্তু নির্মম ভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা জন্মেছে। যার ফলে বুঝে না-বুঝে তারা নির্দয় ব্যবহার করে। আর সেই পলায়নের পর থেকে আদিবাসীদের স্বভাবের মূলেও একটা পলায়নের সংস্কার জন্মেছে। এই দুখিয়ার কুঠির মাটিতে ভোটদের সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির যুদ্ধ যেন তেমনি একটা কুরুক্ষেত্রেরই অভিনয়। যদি উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তবে ভাটিয়ারা স্রোতস্বতী নদী, আর আদিবাসীরা সরোবর। বদ্ধ জল বলতে পার কিন্তু জলের নিচে যেমন পঙ্ক, জলের বুকে কহ্লার কুমুদও ফোটে দু-একটা। শান্তির কথা মনে হয় তার পাশে দাঁড়ালে। একদিন সুতীব্র-গতি পার-ভাঙ্গা নদী আবর্তে আবর্তে মকর কুম্ভীর নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত দেখে কোন কবি বলতে পারে নদীর চুম্বনে সরোবরের বুকে আলোড়ন জাগছে, তারপর একসময়ে কুমুদিনীরা হারিয়ে যায়, সর বনের চিহ্ন মাত্র থাকে না। প্রবল নদী সেই সরোবরের সবটুকু আত্মসাৎ ক'রে নেয়। নদীর গতিপথে সরোবর নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়।

মাতালু আজকাল শহরে যাচ্ছে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই। তার পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। টাকা খরচ করার ব্যাপারে তার হাত হয়েছে দরাজ। একদিন আই দেখতে পেলো মেঝে খুঁড়ে টাকার ঘট বার করছে মাতালু। হিসেবী গৃহিণীর মনে প্রথমে একটা প্রতিবাদ দেখা দিলো, কিন্তু পরক্ষণেই সে মনে মনে হাসলো। আছে—সব ফুরিয়ে দিলেও নতুন ক'রে আবার সংসার করার মতো কিছু লুকানো আছে আই-এর।

মাতালুর শহরের আকর্ষণটাকে ধরতে পেরেছে আই। এবং খুশিই হয়েছে সে। তার কারণ মালতীর ব্যাপারের মতো এ বিষয়ে

বোধ হয় ব্যথতার জ্বালা নেই, মাতালুর মুখে যেন বরং একটা তৃপ্তির ভাবই দেখতে পায় সে। খোঁজ করার দরকার নেই, ছেলেই খোঁজ দেবে একদিন, যদি খোঁজ করার মতো হয়। ফুলমতী বলেছে তাব নাম নাকি কমলা। ভাটিয়ার মেয়েই সেও।

আর পরিবর্ত্তনের কথা বলছ? কি পরির্তন কখন হবে কেউ কি বলতে পারে? দুখিয়ার কুঠির কি পরিবর্তন হয় নি? আই প্রথম যেদিন এসেছিলো আর আজ—অনেক পার্থক্য আছে। আই চিন্তা করলো হাসি-হাসি মুখে ঃ

বিশ-বাইশ বছর আগেকার ঘটনা। সেটেলমেণ্টেব দু'এক বছর আগেই হবে। তখন দুখিয়ার কুঠিতে খুব কম লোকই ছিলো।

সদরে রাজধানীতে একটা ঘটনা ঘটলো—এক রাজপুরুষেব স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলো। লোকে অবাক, রাজপুরুষের আত্মীয়-স্বজন বিব্রত, দাস-দাসীরা মাথা হেঁট কবলো। লোকে করলো ছি-ছি, আত্মীয়-স্বজনরা চূড়ান্ত শাসনেব ভয় দেখালো, দাস-দাসীরা দীন হ'য়ে গেলো নিশ্চিন্ত আশ্রয় ভেঙে পড়াব আশঙ্কায়, কিন্তু সেই স্বামী-পরিত্যাগিনী মেয়েটিব মনের জোর ছিলো, আর তার মতামতকে শক্তি দেয়ার মতো আবও অনেক লোক নাকি ছিলো কোলকাতা নামা এক শহরে। একদিন সেই স্বামী পরিত্যাগিনী সত্য সত্য এক ফোঁটা চোখের জল না-ফেলে কোল-কাতাতেই চ'লে গেলো। রাজধানীকে এখন যদি ভাটিয়াদের কেল্লা বলা যায়, কোলকাতা তবে ভাটিয়াদের পিতৃভূমি। কারণ রাজধানীতে ভাটিয়ারা যা কিছু করছে তা কোলকাতার অনুকরণে।

কিন্তু কি কারণ ছিলো এমন একটা বৈপ্লবিক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটবার। সেই রাজপুরুষ নাকি একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছিলো। অথচ সেই রাজপুরুষের পিতৃ-পিতামহের সময়ে হারেম ছিলো, বহু নারী সেখানে প্রকাশ্যেই রাজপুরুষদের সঙ্গ-কামনা নিয়ে

বাস করতো। এই রাজপুরুষই বরং একটা আধুনিকতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে হারেম ভেঙে দিয়েছিলো। প্রকাশ্যে অন্তত সে ছিলো একপত্নীক। তারই ভাগ্যে ঘটলো এই বিড়ম্বনা।

স্ত্রী কোলকাতায় চ'লে যাওয়ার পর রাজপুরুষের মনে ধিক্কারের মতো একটা ভাব জন্মেছিলো, তারই ফলে সেও করলো দেশত্যাগ।

বহু সুন্দরী নারী ছিলো তার বাড়ীতে পরিচারিকা হিসাবে। নানা বয়সের তারা। তাদের একজনের বয়স তখন বছর কুড়ি হবে। অপূর্ব সুন্দরী সে; তার সৌন্দর্যের খুঁত হিসাবে তার চাপা নাকের কথা বলা যায় বটে, কিন্তু সেটা যেন তার সৌন্দর্যকে স্বাতন্ত্র্যই দিয়েছিলো। তার উপরে সেই রাজপুরুষের স্ত্রীকে অলঙ্কার পরানোর ভার ছিলো।

বড়ো গোলমালমাল সেদিন রাজধানীতে। যেন একটা বিপৎকাল উপস্থিত এমন ভাবে নগরবাসীরা ছুটোছুটি করছে। খোলা কিরিচ হাতে ঘোড়সওয়ার সৈনিকরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। যে কোনও অপরাধ করে নি সেও দণ্ডভয়ে সংকীর্ণ।

সেই সুন্দরী পরিচারিকাটির মনে হ'লো আরও কিছু ঘটে যাবার আগে পালাতে হবে। কিন্তু পালানো বললেই তা হয় না। সিন্দুকে যে সব মহামূল্যবান অলঙ্কার ছিলো, তার কিছু নিয়ে গেছে কোলকাতার মেয়ে, আর কিছু নিয়েছে রাজপুরুষ নিজে। কিন্তু একটা ছোটো পেটিতে কিছু অলঙ্কার ছিলো পরিচারিকাটির তত্ত্বাবধানে। কি হবে, কাকে দিয়ে যাবে সেগুলি সে? অনেক চিন্তা ক'রে পেটির অলঙ্কার-গুলি একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে সেই পরিচারিকাটি হাঁটতে সুর করলো।

শহরের বাইরে যখন সে পা দিয়েছে তখন সে দেখতে পেলো তার সম্মুখে পুবমুখী একটা পথ। সেই পথটাই ধরলো সে। কিন্তু কোথায় সে যাচ্ছে? শহরের কোলাহল শেষ হয়েছে

যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হ'লো সঙ্গে যে পুঁটুলিটা আছে সেটাকে নিয়ে আসা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। ইতিমধ্যে ভারি বোধ হচ্ছে সেটা, আর তার ভিতরের চোখ-ধাঁধাঁনো সোনা-জহরতের গায়েই যেন সহস্র চোখ বসানো। ওদিকে রাত হ'য়ে আসছে। নিরুদ্দিষ্ট পথে আশ্রয়ের আশ্বাস নেই। পথের ছ'পাশে ঘাসের জঙ্গল, কোথাও শালের বন। কিছুক্ষণ আগে ছ'জন লোক যেন তার পিছন-পিছন আসছিলো। তারা কি জানে কি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে সে? জানাই সম্ভব। আর নাও যদি তা জানে, তাকে তো দেখতে পাচ্ছেই তারা। পরিচারিকা সেই রাজপুরীর অনেক উষ্ণ বিলাসের রাত্রির প্রান্তদেশে কাটিয়েছে। তার কুড়ি বছর বয়সের অভিজ্ঞতা এই, তাকে দেখলে পুরুষরা কেমন যেন মাতালের মতো হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ইতিমধ্যে শহর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছে, এখন সেখানে ফেরা আর সম্ভব নয়। এখানে নির্জনতা, আরও দূরে হয়তো নির্জনতা আরও বাড়বে। কিন্তু শহরের পথে পথে এখন যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নয়, উন্মত্তও বটে। কি করলো সে? হায়, একি বোকামি! নিজের যৌবন এবং জহরতের পুঁটুলি এ ছ'টিকে নিয়ে সে কোথায় পালাবে! বুদ্ধি গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। পা চলতে চাচ্ছে না। পথের শেষে কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই। পিছনে পায়ের শব্দ হয়, এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যাচ্ছে মানুষরা। পরিচারিকা সব গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমাগত এগিয়েই যাচ্ছে। একটা বিষয়ে সে শুধু মনকে শাসনে রেখেছে, সে ছুটে পালানোর ভঙ্গি নেবে না; অতি দ্রুত চলবে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে, কিন্তু ভয় পেয়েছে এ-রকম ভাব ফুটতে দেবে না। পিছন থেকে কেউ তাকে স্পর্শ করবে এ ভয়ে শরীর শিউরে উঠছে তার, পিঠটাই সংকীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, তবু জহরতের পুঁটুলি বুকের কাছে চেপে ধ'রে সে চলছে।

যৌবন ও জহরত, রূপ এবং রত্ন—এদের যেন একটা আকর্ষণ

আছে এবং সেই আকর্ষণই যেন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে। পায়ের তলায় কিছুক্ষণ থেকেই একটা জ্বালা সুরু হয়েছে, বোধ হয় ফোসকা পড়েছে। কান্না পাচ্ছে। প্রকাশ্যে কাঁদবার উপায় নেই। গল্পে শোনা গেছে আত্মাকে গাছের কোটরে লুকিয়ে রাখা যায়, যদি সে পারতো রূপ ও রত্নকে তেমনি কোথাও রাখতে।

মানুষের দেহ তার মনের কাছে হার মানে না, মনকেও কখন কখন হারিয়ে দেয়। দেহ এবং মনে বিবাদ লেগেছিলো তার। আতঙ্কিত মন ছুটে পালাতে চাচ্ছে, আর দেহ সেই পথের ধুলোতেই লুটিয়ে প'ড়ে বিশ্রাম নিতে চাচ্ছে। পথের ধারে শালবন। সেই শালবনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অগম্য একটা অংশ খুঁজে নিয়ে জহরতের পুঁটুলির উপরে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

দ্বিতীয় দিন এলো। ইতিমধ্যে একটা ছোটো নদী পার হয়েছে সে—সামনে বোধ হয় আর একটা নদী। এখানে পথ অপ্রশস্ত। কোথাও কোথাও দু'পাশের জঙ্গল বেড়ে এসে পথকে ঢেকে ফেলেছে। পথের শেষে কিছু দূরে দূরে ঘাসের জঙ্গলের আড়ালে দু'একটি গ্রাম চোখে পড়ছে। সকাল থেকে এ-রকম দু'একটি গ্রাম পার হয়েছে সে। ক্ষুধার তাড়না থেকে থেকে কষ্ট দিচ্ছে তাকে। সে কি গ্রামে যাবে এখন? কি ভুল করেছে সে জহরতের পুঁটুলিটার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত ক'রে। সে কি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রে ছুটে চলবে!

নদীটা বড়ো জল গভীর ব'লে মনে হয় না, কিন্তু খাতটা চওড়া। বর্ষায় নিশ্চয়ই প্রবল হয়। পথ সে অনেকক্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। শালগাছের ফাঁকে ফাঁকে কখন সে পথের দেখা পাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কোন নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা মনে হয় না। সে নদী পার না হ'য়ে, তার কূলে কূলে হাঁটতে সুরু করলো।

একটা অদ্ভুত কথা তার মনে হ'লো, কেউ কি তাকে আশ্রয় দিতে

পারে না? ক্লান্ত অবসন্ন মনে এ-কথাটাই বার বার পাক খেতে লাগলো। কোন পুরুষ, যে কোন পুরুষ। সে এবং তাব যৌবন এবং তার জহবতকে আশ্রয় দেবে এমন কোন পুরুষ। যদি সে এই ছুটোছুটির আতঙ্ক থেকে তাকে বাঁচায়। একটা যে কোন বকমেব আশ্রয়ে বসতে পাবার আশ্বাস পেলে সে পুরুষকে তাব রত্নেব ভাগ দিতে পারে, যৌবনের অংশীদার করতেও রাজি আছে। কিন্তু সে পুরুষ যেন সবল হয়, অন্যের ক্রুব লোভ থেকে বত্ন ও রূপকে যেন রক্ষা করতে পারে।

আমাদের এই কাহিনী কোন সার্থকতর কূলে পৌঁছুতে পারতো তা নিয়ে গবেষণা করা বৃথা। এই নদীর কূলেই গতি পরিবর্তন হ'লো গল্পের।

হঠাৎ চমকে উঠে পরিচাবিকাটি দেখতে পেলো—কে একজন এক হাঁটু জলে নেমে জল খাচ্ছে। আঁজলা ক'রে জল না তুলে নিচু হ'যে প'ড়ে চুমুক দিয়ে জল শুষে নিচ্ছে—আঁজলা ক'বে জল তুলতে গেলে যেন ময়লা উঠে পড়বে।

বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে লোকটিকে দেখতে লাগলো পরিচারিকা। পুরুষ, কিন্তু পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত নয়। লম্বাটে কালো চেহারাব বোগা একটি ছোকরা। উপবের ঠোঁটে গোঁফের বেখা উঠেছে কি না-উঠেছে। গায়ে ছেড়া জামা, পবনে অত্যন্ত ময়লা কাপড়। জলে একটা পাখি বসেছিলো। লোকটি ঢিল তুলে পাখিটাকে মারবার চেষ্টা করলো। পাখিটা উড়ে গেলে একটা গাছেব তলায় ব'সে সে বিড়ি ধরালো।

পরিচারিকার মনে অনেক জটিল চিন্তা দেখা দিলো। তার মধ্যে একটি এই ছিলো—লোকটি তার সঙ্গে গায়েব জোবে পারবে না। সেই তো ভালো, সেই তো ভালো। একটা ঢিল তুলে নিয়ে পারিচারিকা ছুঁড়ে মারলো। লোকটির ঢিলটা যেখানে পড়েছিলো

তার ঢিলটাও তার কাছাকাছি গেলো। লোকটির কাছে তার প্রাধান্য একেবারে নষ্ট হবে না। দেহ এবং বুদ্ধিতেও বোধ হয় লোকটির উপরেই তার কিছু প্রাধান্য থাকবে। রত্নের পুঁটুলি কেড়ে নিতে পারবে না, রক্ষা করতে সহায়তাই করতে পারবে।

লোকটি পরিচারিকাকে দেখে অবাক হয়েছিলো।

'কোথায় যাবে?' সে প্রশ্ন করলো।

'জানি না। তুমি কোথায় যাবে?'

'গদাধরপুর, পথ জানো?'

'না।'

পারিচারিকা কয়েক পা এগিয়ে গেলো। তার ভবিষ্যৎ চিন্তার বহিপ্র্রকাশগুলি ইতিমধ্যে তার চোখেমুখে ও দেহভঙ্গিতে একটা কামনার আমন্ত্রণ হ'য়ে ফুটিফুটি করছে। লোকটি দর্শনীয় কিছু নয়, বলিষ্ঠ নয়, হয়তো বা সব দিক দিয়েই নির্গুণ। তবু পুরুষ, যে সঙ্গী হ'তে পারে। আর এইতো ভালো যে যৌবন ও রত্নের উপরে কিছু প্রাধান্য পরিচারিকা রাখতে পারবে।

'বিড়ি খাবা?'

পরিচারিকা ছোকরার হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ধরালো, কাশলো।

দু'জনে পরামর্শ ক'রে আহার সংগ্রহ করেছিলো গ্রাম থেকে। তিনদিন তারা অরণ্যে কাটালো। চার দিনেব দিন নদী পার হ'লো তারা। রত্নের পুঁটুলিটা এখনও পারিচারিকার কাঁকালে, কিন্তু পুরুষটির ডান হাতখানা সে পুঁটুলিটা বেষ্টন ক'রে পারিচারিকার কোমরে রয়েছে।

তখন দুখিয়ার কুঠিতে এত লোক ছিলো না।

খোলা আকাশের নিচে তিন চারটি রাত কাটিয়ে তারা অসুস্থ বোধ করছিলো। পুরো একটা আহারের ইচ্ছাও তাদের মনে দেখা দিয়েছিলো। পারিচারিকার মনে গ্রামের ভয়ও আর ছিলো না।

তারা পায়ে পায়ে চ'লে এই গ্রামটায় পৌঁছে একটা ভাঙা ভাঙা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিলো। গ্রামটা দুখিয়ার কুঠি। বাড়িটা রংবরের। সেই বাড়ীতেই আশ্রয় পেয়েছিলো পরিচারিকা। সে এবং তার বন্ধু। রংবর তার রূপলাবণ্য দেখে নাম দিলো আই—ডাঙ্গর আই।

চার পাঁচ মাস পরে একদিন আই-এর বন্ধু সেই ছোকরা চ'লে গিয়েছিলো। কোথায় গেলো কেউ জানে না। সেই অলঙ্কারের পেটির একাংশ লুকিয়ে রেখেছিলো দু'জনে পরামর্শ করে, কিছু অবশ্য গায়ে দিত আই। আই জানে সেই লুকিয়ে-রাখা অলঙ্কারগুলি নিয়ে গিয়েছিলো সে-ই, অন্য কারো জানবার কথা নয়। যৌবন? কেউ তা নিতে পারে? এই চল্লিশ বছরের পারে এসে অলঙ্কারহীন প্রসাধনহীন আই এখনও দশ গাঁয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপসী। সেই বন্ধুত্বও বৃথা নয়, মাতালুকে পেয়েছিলো আই।

তারপর কত ঘটনাই ঘটলো। এ গ্রাম ও-গ্রাম থেকে লোক এসে বসতে লাগলো দুখিয়ার কুঠিতে। কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেছে তাদের আই। অলঙ্কার বিক্রি ক'রে নিজের জন্য জমিজিরাৎ কিনেছে আই। তাতে তার চরিত্রের সতর্ক গৃহিণীপনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অলঙ্কার বিক্রির টাকা কখনো ঋণ দিয়ে কখনো দান ক'রে দুখিয়ার কুঠিতে লোক বসানোর চেষ্টা করেছিলো কেন তা বলা কঠিন। রূপ ও রত্ন নিয়ে নির্জনতায় বাস করতে ভয়? অথবা স্তাবকহীন সম্পদ গৌরবহীনও বটে—এই সে অনুভব ক'রে থাকবে। সেটলমেণ্ট হ'লো, হেরম্ব-গজানন এলো। গ্রামের চেহারা বদলাচ্ছে এখনও। আই চিন্তা করতে গিয়ে দেখতে পায় শহরও বদলাচ্ছে। ভাটিয়ার চাইতেও ভাটিয়া আছে। পুরনো ভাটিয়ারা নতুন ভাটিয়াদের আনা পরিবর্তনগুলি মেনে নেয়। এমনি একটা পরিবর্তনের তাগিদেই হয়তো রাজপুরুষের স্ত্রী কোলকাতায় চ'লে

গিয়েছিলো। অর্থ ও বিলাস তাকে ধ'রে রাখতে পারে নি হারেমে। আর সেই আলোড়নেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো আই একটা নতুন পথের উপরে।

তেমনি একটা পরিবর্তন আসতে পারে মাতালুকে অবলম্বন ক'রে। শহরে মালতীর পরিবর্তে যার সঙ্গে মাতালুর দেখা হয়েছে হয়তো পরিবর্তনটা আসবে তার পায়ে পায়ে।

চিন্তা করতে গিয়ে আই অন্যমনস্ক হ'য়ে ভাবলো মালতীর মতো নয় কমলার ব্যাপার। মাতালুর দৃষ্টিতে স্নিগ্ধতা এসেছে, তৃপ্তির ও শান্তির চিহ্ন সেটা। আই স্বপ্ন দেখার কাছাকাছি চ'লে যায় - পৌত্রদের স্বপ্ন। অবশ্য একথা বলা যায়, কমলার সম্বন্ধে সব খবর সে রাখতো না।

লখাই চক্রবর্তী গদাধরের তীরে শহর থেকে অনেকটা দূরে একটা হাস্যকর পরিস্থিতিতে বসেছিলো। এখন সে নিচে ব'সে স্যাণ্ডউইচ খাচ্ছে, ফ্লাস্কে কিছু মদ আছে। সন্ধ্যার পর সে গাছে উঠে বসবে। আপাতত কেউ তাকে তাড়া করছে না। এক ঝাঁক মশা শুধু পিছনে লেগেছে।

মশার কামড়ে বিরক্ত বোধ হচ্ছে। পৃথিবী, সভ্যতা, জীবন সব কিছুর উপরেই বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে পড়ছে তার। নিজের প্রতি এবং থেকে থেকে মালতীর প্রতিও একটা অসহিষ্ণুতা অনুভব করছে সে। তার রাগও হচ্ছে। বিরক্তি থেকে বিষাক্ত বাষ্প উঠে পড়ার মতো একটা অনির্দিষ্ট বিদ্বেষও সে অনুভব করছে। মালতী ঘরে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে, আর সে এই হাস্যকর অবস্থায়, সভ্য জগতের অনুচ্চারিত ধিক্কার শুনছে।

কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়ার ব্যাপার নয়। অদৃষ্ট ব'লে সহ্য করাও যাচ্ছে না। অতীত যেন পিছনে পিছনে না-চ'লে সামনে এসে

দাঁড়ালো, নির্বোধের মতো হাসছেও হিহি করে।

রাগে দুঃখে চোখ ফেটে জল আসতে চাচ্ছে লখাই-এর। এমন ঘটনাও মানুষের জীবনে ঘটে? পাঁচ সাত বছরে পারস্পরিক একটা বিস্মৃতি এসে গেছে এই আশা করেছিলো সে। কিন্তু শোনা গেছে পাণ্ডারা দু-তিন পুরুষ পরেও যাকে চিনবার তাকে চিনে নেয়। এরা তার চাইতে কম নয়। খবরটা পেয়ে সে প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলো। পরে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু কমলার ঘরে শুধু একটু ঘুমুব ব'লে যে বিদেশি আশ্রয় নিয়েছিলো সে এতদূর বৃথাই আসে নি। তার কথা থেকে লখাই বুঝতে পেরেছিলো সব কিছু ঝেড়ে ফেলা যায় না। এ-ক্ষেত্রে তো তা যাবেই না। দল-ত্যাগের শাস্তি তারা কি আর দেবে? কিন্তু যে কোন একটা গোলমাল হ'তে পারে, আর তার ফলে মান-সম্মান ব'লে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শহরের ঝকঝকে আধুনিক কায়দার বাড়ি, স্ত্রী মালতী, কিছুই যেন তারপরে তাকে আর মানাবে না। তার চাইতে আপসমুখী মনই ভালো, বন্ধুতার অভিনয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্যাপারটা হচ্ছে মাদক-দ্রব্যের চোরা চালান। এক সময়ে লখাই বাংলা থেকে আসামে আফিমের যাত্রাপথের একটা বিশেষ অঞ্চলের যোগসূত্র ছিলো। কিন্তু কেউ কি বুঝবে না সেদিনের অসহায় লখাই-এর কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ছিল এ-পথে আসবার। তখন বর্তমানই ছিলো প্রবল, সেই প্রত্যক্ষ জগতে দৈহিক প্রয়োজনগুলো মিটানোই ছিলো তার একমাত্র প্রয়োজন। লখাই-এর অন্তরাত্মাই যেন কেঁদে উঠলো—বলো কি উপায় ছিলো তখন, এরা তবু তো সঙ্গী হিসাবে নিয়েছিলো, অসুখ-বিসুখে সেবা শুশ্রূষাও করেছে। সদরের শহরে শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কেউ কিছু দেয় নি তাকে। সে শুনেছিলো গদাধরপুরের নতুন শহরে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ আছে। কিন্তু

সেখানে পৌঁছেও দেখেছিলো ব্যবসা করতে শুধু উৎসাহ উদ্দীপনাই যথেষ্ট নয় মূলধন দরকার, ক্রেতার চাহিদা দরকার। আর তখন সে কি কখন কল্পনা করেছিলো এই শহর এমন রূপ নেবে, কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক মানুষ হওয়ার সুযোগ তার জীবনে আসবে? একি আর সেই শাসনহীন এলেকা? দেখো বদন মাষ্টারের কি হ'লো। এতদিন পরে পুলিশ খুঁজে বার করেছে সে অপরাধী, আত্মগোপন ক'রে আছে। এখন গদাধরপুর দস্তুর মতো সভ্য শহর।

সে নিজেকে কখন অসাধারণ কিছু মনে করে নি। সে যা কিছু সঞ্চয় করেছে তার মূলে আছে অসীম দুঃখবরণ এবং অনেক দুঃসাহস। অনেক আহারহীন দিন অনেক নিদ্রাবঞ্চিত রাত্রি অতিবাহিত করেছে সে পথে বিপথে বনজঙ্গলে। তখন সে ভেবেছে মানুষ নেশা করবে কাজেই নেশার জিনিস চালান দেয়ায় দোষ নেই। কিন্তু সমাজের যে ধাপে বর্তমানে সে আছে তা'তে সে অনায়াসেই বুঝতে পারে সভ্যতা অত সহজ এবং সরল কিছু নয়। এবং সে নিজের প্রয়োজনেও আগেকার সেই কাজগুলোকে সমর্থন করতে পারে না।

কিন্তু শুধুতো বন্ধুত্ব রক্ষাই নয়, লোভও হয়েছিলো তার হঠাৎ প'ড়ে-পাওয়া এই লাভের প্রতি। এই শেষ বার, ব'লে মনকে বুঝিয়েছিলো। কিন্তু এখন?

হা ভগবান, হা ভগবান! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো।

অনেক কথাই মনে পড়ছে তার। মালতীর সন্তান-সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিতও যেন পেয়েছে সে। হায়, সেও কি ভবিষ্যতে কলঙ্ক বহন ক'রে চলবে!

আর অকারণেই যেন তার কথাও মনে পড়েছে লখাই-এর। কোন কোন মানুষের গঠনে এমন একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যে তার কথা ভাবতে গেলে তার বিশেষ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথাই মনে পড়ে।

তার পেনসিলে টানা ভ্রূর মতো সরু ভ্রূ, আর তার খোঁপা থেকে বেরিয়ে-থাকা চুলের লালচে ডগার কথাই বেশি ক'রে মনে পড়ে লখাই-এর। সেই চুলের ডগা যেন সজীব কিছু, যেন তা বসন্তের কোন স্ফূর্তিবাজ পাখির পুচ্ছ। গত জীবনের জন্য আক্ষেপ যদি কিছু থাকে লখাই-এর তবে সেটা তার জন্য। কোন কোন সময়ে দেহের অভ্যন্তরে একটা পৃথক চেতনার মতো তার স্পর্শের স্মৃতি জেগে ওঠে। কিন্তু ভুলবার চেষ্টাই কবেছে লখাই তাকে। সে কি ফিরে গিয়ে বলতে পারে, আমি তোমার জহরত চুরি কবি নি? আর তখন তখনই যা পারেনি এখন তা সম্ভব হ'বে কি ক'রে। দুখিয়ার কুঠিতে একটি আদিবাসী বমণীব মোহে আদিবাসী হ'য়ে যেতে তখনই তার আপত্তি ছিলো। তবুও অবাক কাণ্ড দেখ, কখনই তাকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হওয়া যায় না। মালতী এবং সে সময়ের অনেক গোপন রাত্রির আশ্রয়স্থল কমলাও পারে নি তাকে ভোলাতে। বরং লখাইএর চিন্তায় তাদের তুলনায় অন্তত এই মুহূর্তে সেই রূপ ও রত্নময়ী আদিবাসী রমণী বেশী দেখা দিচ্ছে। তার সান্নিধ্যে এই স্নায়ু পোড়ানো যন্ত্রণা নেই। সেখানে অন্তত ঢিলে ঢালা সহজ ভাব ছিলো। প্রতিষ্ঠার চূড়া থেকে পড়ে যাবার ভয় ছিলো না।

দিগন্তে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে আসছে। এই পথেই তাদের আসবার কথা গদাধরের তীর ধ'রে। কি করবে লখাই। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটানো যায়, কিন্তু ফণিমনসার জঙ্গলে ভরা শাসনসীমার বাইরে প'ড়ে থাকা অরাজক অঞ্চল আর নয় গদাধরপুর।

আর কাঁকরু। ডালকুত্তা সে দেখে নি, কিন্তু তেমনি যেন সে। অহর্নিশি সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আফিমের চোরাকারবারীকে ধরতে।

॥ সতরো ॥

স্বপ্নে কুয়াসার জালে আটকে পড়া এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। না যায় এগোনো, না যায় পিছানো। রসাতলে ডুবে যাওয়ার মতো অনুভব হ'তে থাকে, উদ্ধারের চেষ্টায় আঁকুপাকু করে মানুষ।

মালতীর ঘর থেকে সেদিন যে বিমুগ্ধ ভাব নিয়ে সে বেরিয়েছিলো সেটা যেন মন্ত্রের মতো কিছু। এ-দেশে এখনও মন্ত্রে বিশ্বাস করতে দেখা যায় অনেককে। একদিকে যুক্তি বুদ্ধি, আর একদিকে সেই মগ্ন আলোকে অদৃশ্যপ্রায় গৃহসজ্জার মধ্যে অনুভবগ্রাহ্য মালতী। আলো নিবে যাবার আগের মুহূর্তে দেখা মালতীর প্রসাধন-শাণিত অবয়ব।

ইতিমধ্যে একদিন মাতালু খানিকটা ঝাঁজের সঙ্গেই বলেছে রংবরকে সে ঝকঝকে ইট কাঠের বাড়ি করবেই যতই তারা তাকে অহেতুক বলুক। মাতালুর ইচ্ছা হয় মালতীর ঘরের মতো একখানা ঘরের চার দেয়াল তাকে ঘিরে রাখুক। অসম্ভব ইচ্ছা নয়। সে মাতালু ধনী। দুই খন্দের ধানে সে পারে তেমনি একটা বাড়ি তুলতে।

কিন্তু বাড়ি তোলা আর তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা এক ব্যাপার নয়।

অনুভবটা যেন একটা স্বল্প-পরিসর জায়গায় আবদ্ধ থাকার মতো। কে যেন তার হৃৎপিণ্ডকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে।

কাঁকরুর হাত দিয়ে কমলাকে কয়েকটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে

মাতালু। একবার তার মনে হয়েছিলো কমলার কাছেই কেঁদে কেঁদে বলবে তার কষ্টের কথা। কিন্তু তাতে কমলারও কষ্ট হবে হয়তো। মালতী কি সত্যি এত নির্দয়? নির্দয় না হ'য়েই বা উপায় কি তার।

কমলার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছিলো মাতালু। এক সময়ে সে বিস্মিত হ'য়ে আবিষ্কার করলো সে মালতীর বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। সেই জানলাটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালো সে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সে দেখলো মালতী ঘরে ঢুকে একটা টেবিলের সামনে বসলো। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা বই খুললো। আজও বোধ হয় লখাই বাড়িতে নেই। সময়ের জ্ঞান ছিলো না মাতালুর। মালতী বই-এ মন বসাতে পারলো না। উঠে একবার পায়চারি করলো। কি মনে ক'রে উঠে এসে দাঁড়ালো জানলাটায়। যেন নিশ্বাস নেবার জন্যে। মাতালু দেয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে সরে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মালতী জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে স'রে গেল। মাতালু যেমন তাকে দেখতে পেয়েছিলো সেও কি তেমন মাতালুকে দেখে নি? সে কি মাতালুর চাপা নিশ্বাসের শব্দে ভয় পেলো?

কাঁকরু এসেই দোতারা নিয়ে ব'সে। টংটাং ক'বে বাজাতে বাজাতে একটা বা গানই ক'রে ওঠে সে। কো-ন্বা আ হা হস্তে কদমেরো ফুল। পৃথিবীতে কত কন্যাই তো আছে। তাদেব হাতে কদমের ফুল থাকাও সম্ভব।

কাঁকরুকে আজকাল একটু শীর্ণ দেখায়, কিন্তু তার দৃষ্টি যেন শাণিত হয়েছে। রাত্রিতে সে আজকাল ঘুমায় না। পরনে নেংটি, কাঁধে কালো সুতোর কম্বল, পায়ে মোটা চামড়ার জুতো। কোন দিন হাতে গুড়াল বাঁশ থাকে, কোন দিন থাকে না। কিন্তু দোতারা থাকে। রাত্রিতে একা একা বনে জঙ্গলে ঢুঁড়ে বেড়াতে

হয় তাকে, তখন দোতারার মতো সঙ্গী আর কে ?

কাঁকরু এখন জানে সে একসাইজ বিভাগে কাজ করে। দু সপ্তাহ থেকে তাদের কাজ বেড়ে গেছে। সদর থেকে দশ বারজন ভাটিয়াও এসেছে এখানকার বাহিনীর শক্তি বাড়ানোর জন্য। কাঁকরুর প্রধান কাজ হচ্ছে তাদের এ-অঞ্চলের পথ ঘাট চিনিয়ে দেয়া। বনের মধ্যে দিয়ে যে অসংখ্য সুঁড়ি পথ ইতস্তত ছড়িয়ে গেছে—তার কোন কোনটা গোলকধাঁধার মতো ক্রমশ গভীর অরণ্যের দিকে চ'লে গেছে, কোনটা বা গদাধর নদীর পারে সুরু হ'য়ে অনেক ঘুরে আবার সেই নদীতেই ফিরেছে—এ সব বুঝিয়ে দেয়াই কাঁকরুর কাজ। কিন্তু রাত্রির অরণ্যে ভাটিয়া পুলিসরা যেতে চায় না। কাঁকরু তাদের বলেছে দিনের বেলার পথ আর রাত্রির পথ এক নয়, রাত্রির পথ চিনে রাখ। তারা বলে, প্রয়োজন হ'লে তারা চিনে নেবে।

উপরওয়ালারা খবর পেয়েছে সদরে ব'সে—অনেক আফিম নিয়ে একটা জাহাজ এসেছিলো দক্ষিণে কোন বন্দরে। নানা লোকের হাতে সেটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের প্রধান গন্তব্য আসাম, আসাম ছাড়িয়ে ব্রহ্ম সীমান্ত। অনেক দিন থেকেই এই চোরাকারবার চ'লে আসছে কিন্তু লোকগুলোকে ঠিক ধরা যাচ্ছে না সন্দেহ করলেও। আসল লোকগুলি যে গদাধরপুরের কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে এটাই তাদের ধারণা। আফিমের প্রবাহ পথে কোথাও তারা বাধা দেয়নি, সেটা শুধু কারবারীদের হাতেনাতে ধরার জন্যে।

সংবাদগুলো গোপনীয়, কিন্তু কাঁকরু একদিন মাতালুকে বললো। শুধু পথ চেনানো নয়, কাঁকরুর ধারণা হয়েছে সে কারবারীদের পথটাও চিনতে পেরেছে। দু'একজনকে ধ'রে দিতে পারলে সেও ভাটিয়া পুলিসদের মতো বিশ্রাম নিতে পারতো।

একদিন কাঁকরুর রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে মাতালু ব'লে ব'সলো, 'মুই যাইম রে, বা।'

'কোটে যাবু ?'

'তোর সাথ।'

'জঙ্গলৎ ? কেনে তোর ছুখ্‌ কি ?'

হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে স্থির হ'লো মাতালু যাবে কাঁকরুর সঙ্গে। এটাকে নিছক একটা শখ বলা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু মাতালুর মনে অশান্তি ছিলো তা থেকে অনুমান হয়, সে হয়তো একটা কিছু অবলম্বন হিসাবে খুঁজছিলো। আর অরণ্যের নিস্তব্ধতায় বোধ হয় শান্তিব একটা রূপেব সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ; সে রূপ আদিম হ'তে পারে, তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই অরণ্যস্তব্ধতার প্রতি তার একটা আকর্ষণ আছে।

কিন্তু কাঁকরুর কাজ ছিলো। সে আগের রাত্রিতে যে গাছের নিচে একটি দামী সিগারেটের বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছিলো সেখান থেকেই সে খোঁজাখুজি সুরু করবে। আগের রাত্রিতে গাছের্ উপবে যে-আগুনকে দূর থেকে জোনাকি মনে করেছিলো সেটা নিভন্ত সিগারেটের আগুন ব'লে তার ধারণা হয়েছে পরে। জায়গাটা গভীর অরণ্যে নয়, বরং যেখানে গাছগুলো ফাঁকা ফাঁকা হ'য়ে এসেছে ক্রমশ অরণ্যের সীমান্তে পৌঁছবার আগে সেখানে, গদাধরের পুরনো খাতের দিকে।

পথে বেরিয়ে মাতালু বললো, 'দোতারা বাজাবু না' ?

কাঁকরু দোতারা বাজায় বটে, তবে সেটা এখন নয়, সারা রাত ছুটোছুটির পর ক্লান্তি যখন দুঃসহ হয় তখন, কিংবা হঠাৎ যদি ভয় ক'রে ওঠে গভীর অরণ্যের গাম্ভীর্যে, তখন।

'চোর ভাগি যাইবে।'

'তা যাউক।'

কাঁকরু ভাবলো পথের এই সুরু। এখন কিছুক্ষণ মৃদু শব্দে

বাজানো যায়। আর সব কিছু হিসাব করার পর বন্ধুর সঙ্গে এই রাত্রির পথে দোতারা বাজিয়ে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা চোর ধরার সার্থকতার চাইতে কম নয়। হয়তো বা সভ্য সমাজে একে অপটুতার নিদর্শন হিসাবেই নেয়া হবে।

কাঁকরু দোতারা বাজিয়ে মৃদু স্বরে গান ধরল ঃ হাহারে কুম্‌কুরা স্বুতা হ'লেক লোহার গুনা। হায়, হায়, কি ভাগ্য! রেশমের সুতাও লোহার তারের ফাঁদ হ'য়ে দাঁড়ালো। কেন হয় এমন পৃথিবীতে? অন্য কেউ বলেছে গলার মালা সাপ হ'য়ে দংশন করেছে। কেউ কি এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করতে পারলো? লোহার বাসরে কালনাগ প্রবেশ করে। জনবল, ধনবল, চরিত্রবল সব যেন একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়ায়। এই ফাঁদে প'ড়ে কাঁদা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মাতালু পালাই পালাই করতে লাগলো। সে কাঁকরুর গান বন্ধ করার জন্য বললো, 'থামি যা রে কাঁকরু। থামি যা।'

আকাশে আলোর জোর ছিলো না। রাতের মাঝামাঝি চাঁদ উঠবে। খোলা আকাশের আভাস ছিলো এতক্ষণ মাথার উপরে, নদীর ওপারে শহরের আলোগুলো মিটমিট ক'রে জ্বলছিলো দিগন্তে। এবার কাঁকরুরা অরণ্যে প্রবেশ করছে। যেন এক দুর্গের দরজা পার হ'লো তারা।

আলোর একান্ত অভাব থেকেই বোধ হয় শব্দের অভাবও কল্পনা করে মন। কিন্তু কিছুক্ষণ চলতে না চলতে দু-একটা আরণ্য শব্দ কানে আসতে থাকে। স্বল্পভাষী গাম্ভীর্যের সঙ্গে উচ্চারিত কথার মতই সে শব্দগুলোকে অর্থবহুল ব'লে মনে হয়। ভয় ভয় করে— একদিন কাঁকরুও ভয় পেয়েছিলো।

আজ কাঁকরুর কোন ভয়ই নেই। মাতালু রোজ আসবে না। কাঁকরু ভাবছিলো, অন্যদিন যা সে পারে না আজ তেমনি সাহসই সে দেখাবে।

টর্চের আলো পায়ের কাছে কাছে ফেলে চলছিলো তারা।

মাতালু ভাবছিলো জীবনটা যদি এমনি একটানা অন্ধকার আরণ্য পথে চলা হ'তো বোধ হয় কষ্ট অনেক কম হ'তো মানুষের।

এ-জায়গাটায় বোধ হয় ঝিঁঝিদের একটা কলোনি। কানে তালা লাগিয়ে গিয়ে তারা ডাকাডাকি করছে। একটা পাখি বোধ হয় তাদের অভদ্রতায় বিরক্ত হ'য়ে থেকে থেকে গম্ভীর গলায় ক্রোক ক্রোক ক'রে উঠছে।

ঝিঁঝিদের সীমান্ত পার হ'য়ে কিছু দূরে গিয়ে কাঁকরু থেমে দাঁড়ালো। টর্চের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে গাছগুলোর অবস্থান দেখলো। ঠিক পথেই এসেছে সে, সামনের ওই ঝাঁকড়া গাছটার নিচেই সিগারেটের বাক্স সে পেয়েছিলো।

লখাই চক্রবর্তী খবর পেয়েছিলো তারা দু'জন আসবে। কাঁকরু ও মাতালু সাবধানে চলছিলো, কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ হচ্ছিলো শুকনো পাতার উপরে। আর তা ছাড়া টর্চের আলো যত স্বল্প-স্থায়ী হ'য়েই জ্বলুক সেটা যে মানুষের হাতে জ্বলছে তা অনায়াসে বোঝা যায়। লখাই আর একটু বুঝতে পেরেছিলো—আগন্তুকরা দু'জন। সে মৃদুভাবে গলায় খাঁকরি দিলো।

শব্দটা কাঁকরুর কানে গেলো। সে নিজে দাঁড়িয়ে পড়লো, হাত ধ'রে মাতালুকেও দাঁড় করালো। দু তিন মিনিট কোন পক্ষে সাড়া শব্দ নেই। কাঁকরু ভাবছিলো, এই গভীর অরণ্যে ওই মৃদু শব্দের অনুসরণ করা বুদ্ধিসম্মত হবে কিনা।

লখাই চিন্তা করলো, এরা কাঁকরুর দলের লোকও হ'তে পারে— তার নিজের লোকও হ'তে পারে। কিছুটা ভালো ক'রে না-বুঝে আত্মপ্রকাশ করা যায় না।

ঠিক এমন সময়ে বাঁয়ের দিকের এক জোড়া টর্চ কিছু দূরে দূরে

জ্ব'লে উঠলো কয়েকবার।

মাতালু ফিসফিস ক'রে বললো, 'কাঁকরু রে মানসি।'

মানুষ তাতে আর সন্দেহ কি। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী বিষ বহন করার জন্য এত কৌশল ও এত বুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারে না।

লখাই এবার খানিকটা সাহস দেখালো। সে টর্চ দিয়ে ইশারা করার জন্য মাটির উপরে কয়েকবার আলো ফেললো।

কাঁকরু বুঝলো কারবারীরা সংখ্যায় ভারি এবং তারা দু'টো দলে ভাগ হয়ে চলছে। সে চিন্তা করার সময় নিতে লাগলো।

এই অবসরে ডান ও বাঁ দিক থেকে কারবারীরা এগিয়ে গিয়ে সামনে এক জায়গায় মিললো। তাদের কারবার করলো। অত্যন্ত চাপা গলায় কি আলাপ করলো, কাঁকরুরা তা বুঝতে পারলো না। তারপর তারা আবার দু'দলে ভাগ হ'লো। এক দল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো, অন্য দলটি যে পথে এসেছিলো ফিরে যাওয়ার জন্য সে পথই ধরলো।

এর নামই নাকি কারবার?—এরই জন্য মানুষ এত বিপদের ঝুঁকি নেয়, আর একে বন্ধ করার জন্যই সরকারের এত তোড়জোড়! কাঁকরু বিস্মিত হ'য়ে দেখছিলো ব্যাপারটা। কর্তব্যবোধের তুলনায় কৌতূহলই তার মনে প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো।

যে দলটি সামনের দিকে যাচ্ছিলো ব'লে মনে হয়েছিলো, সেটা প্রকৃতপক্ষে দল নয়—লখাই একা যাচ্ছিলো আন্দাজে পুবদিক লক্ষ্য ক'রে। তার মনে কিছুটা নিশ্চিন্ততা এসেছে, সিগারেট ধরিয়েছে সে। তার এক হাতে একটা সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগ, অন্য হাতে টর্চ। এক সময়ে সে চামড়ার ব্যাগের পরিবর্তে ধানের বস্তা ব্যবহার করতো, দেশলাই জ্বেলে পথ দেখতো। কিন্তু হঠাৎ তার কানে এলো শব্দ—

শুকনো পাতার উপর কারা হাঁটছে।

প্রাণী নাকি ? বাঘ? ব্যাগ নিয়ে গাছে উঠে বসবে? না তা সম্ভব নয়। জীবনে এই শেষবার সে প্রলুব্ধ হয়েছে। যে ক'রেই হ'ক বিভীষিকার রাত্রি যেন আজকের রাত্রির সঙ্গে শেষ হ'য়ে যায়। রাত্রি শেষ হওয়ার আগে আফিম সমেত ব্যাগটা হস্তান্তরিত করবে সে। কিন্তু শুকনো পাতার মর্মর যেন এগিয়েই আসছে।

তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে ফিরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে বিকটস্বরে চিৎকার ক'রে উঠলো। প্রাণী হ'লে ভয় পাবে, মানুষ হ'লে চিন্তা করবে।

কিন্তু আলোয় সে দেখতে পেয়েছিলো প্রাণী নয়, মানুষই আসছে তাকে অনুসরণ ক'রে এবং পরমূহূর্তে দৌড়ুতে দৌড়ুতে সে শুনতে পেলো তার অনুসরণকারীরাও দৌড়ুচ্ছে। সে বুঝলো এরা আর কেউ নয়—সে যাকে ডালকুত্তা বলে সেই কাঁকরুরই দল। কিন্তু ভেবেছ তোমরা লখাই-এর বয়স হয়েছে? এই অরণ্যপথ তোমাদের বেশী পরিচিত? সে সোজা পথটা ছেড়ে দিয়ে এঁকেবেঁকে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে চললো গভীর অরণ্যের গোলকধাঁধাঁর পথে।

কিন্তু বয়স লখাই-এর হয়েছে। ফুসফুসে একটা ভার বোধ হচ্ছে তার। সে একবার পিছন ফিরে দেখলো পিছনের আলো দু'টোর মধ্যে একটা ব্যবধান দেখা দিয়েছে। একটার প্রায় একশ' গজ পিছনে অন্যটি। সে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে দাঁড়ালো। একটাকে আহত করতে পারলে অন্যটি তার সেবা শুশ্রূষা করার জন্যই থমকে যাবে সেই অবসরে সে পালিয়ে যেতে পারবে। সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বালিয়ে ওদের প্রলুব্ধ করতে লাগলো।

মাতালুই আসছিলো আগে। সে অপ্রস্তুত ছিলো। লখাই-এর পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে সে ভাবছিলো গেল কোথায় লোকটা,

ঠিক সেই মুহূর্তে তার উপরে লাফিয়ে প'ড়লো লখাই। মাতালু প'ড়ে গেল, তার মাথাটা ঠুকে গেলো গাছের গুড়িতে। লখাই যা ভেবেছিলো তাই হ'লো, কাঁকরু এসে মাতালুর কাছে থেমে গেলো।

মাতালুর আঘাত লেগেছিলো বটে কিন্তু বয়স তার পক্ষে ছিলো। লখাই দু-তিন শ' গজ এগিয়ে গিয়েছিলো মাত্র। তারপরই সে দেখতে পেলো দু'টো টর্চই তাকে অনুসরণ ক'রে ছুটে আসছে।

প্রায় মধ্যরাত্রি হ'লো, কিংবা সে সময়টাও পার হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে অন্ধকার অরণ্যের গোলকধাঁধার পথে আরও দু'বার ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিলো পলাতক এবং অনুসরণকারীরা। মাতালুই বারবার কাঁকরুর চাইতে এগিয়ে থাকছিলো ব'লে সংঘাতটা তার সঙ্গেই হয়েছে। তার ফলে আঘাতের দরুণ মাতালুর একটা চোখ ফুলে উঠেছে, মাথার পিছন দিকে খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে; আর লখাই-এর বাঁ চোয়ালটার যেন জোড়া খুলে গেছে। দ্বিতীয় বারের সংঘাতে মাতালুর আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঘুসি খেয়ে লোকটা প'ড়ে গেলে মাতালু থমকে দাঁড়ালো। লোকটার হাতের টর্চটা তখনও জ্বলছিলো। সেই আলোয় মাতালু তাকে চিনতে পেরেছে—লখাই চক্রবর্তী, মালতীর স্বামী! চিন্তা করতে হয়েছিলো মাতালুকে, সেই অবসরে লখাই আবার পালিয়েছে তার টর্চ ও ব্যাগ নিয়ে।

স্নিগ্ধ রাত্রিতে শান্ত গাছগুলো বিশ্রাম করছে। আর তিনটি ঘর্মাক্ত মানুষ দুই দলে ভাগ হ'য়ে এক নির্বোধ খেলায় হিংস্র হ'য়ে উঠেছে।

শক্তি, কৌশল ও বুদ্ধির দম্ভ লখাই-এর মন থেকে স'রে যাচ্ছে। এখন আর সে আগেকার দিনের মতো বন্ধনহীন কেউ নয়—এ-কথাটাই মনে হচ্ছে তার। প্রাণ থাকতে ধরা দেয়া যাবে না—প্রাণের চাইতে বড়ো না হ'লেও মানসম্মান, সমাজ, মালতী সব যেন সেই প্রাণের তুল্য মূল্যবান কিছু।

মধ্যরাত্রিতে যে চাঁদ উঠবার কথা ছিলো তা উঠেছে। বনও এখানে হাল্কা হ'য়ে এসেছে। আগেকার দিন হ'লে ম্লান আলোয় পথ দেখে খোলা জমিতে সে তীব্র বেগে ছুটে পালাতো, কিন্তু আজ তার বন থেকে বেরুতে সাহস হচ্ছে না। এই অস্পষ্ট অন্ধকার তবু ভালো। হয়তো ওরা এখনও তাকে চিনতে পারে নি। আর একটা কথা ইতিমধ্যে পরিষ্কার ক'রে বোঝা যাচ্ছে, ছুটোছুটি ক'রে এদের সঙ্গে আর পারবে না সে। পুরনো নদীর একটা শাখা বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এখানে। এই খালটার এপার থেকে ওপারে কয়েকবার যাওয়া আসা ক'রে ওদের ধোঁকায় ফেলে পালানোই একমাত্র নিষ্কৃতির উপায় এখন। সেই অবসরে শেষবারের মতো কোন কৌশল আবিষ্কার করতে হবে।

আফিমের ব্যাগটা সে ইতিমধ্যে ফেলে দিয়েছে, এখন শুধু আত্মগোপন ক'রে স'রে পড়া। ওরা ডুখিয়ার কুঠি থেকে বেরিয়েছে, আর সে যদি পুবের পথ ছেড়ে দিয়ে সেই গ্রামেই ফিরে যায়?

ডুখিয়ার কুঠি, ডাঙ্গর আই, সেই পেনসিলে টানা ভ্রূ, সেই বসন্তের পাখির পুচ্ছের মতো খোপা থেকে বেরিয়ে থাকা চুলের গোছা।

মাতালু ভাবছিলো: মালতীর স্বামী তাতে তার কি? এই ছুটোছুটি ও ঘাত-প্রতিঘাত একটা বৈরী ভাব জন্মিয়েছে তার মনে। তা ছাড়াও আর একটা অন্ধ যুক্তিহীন বিদ্বেষও যেন জেগে উঠছে সেখানে। তার স্বরূপ সে বুঝতে পারছে না কিন্তু মূলত সেটা মালতীকে অধিকার করা নিয়ে। যেন লখাইকে আঘাত করা দরকার। কিন্তু মালতীর আপন জন তো।

লখাই ভাবলো: মাতালুকে সে চিনতে পেরেছে, তেমনি তারও তাকে চিনতে পারাই সম্ভব। তা হ'লে এ লুকোচুরিতে আর লাভ কি? লাভ কি? কিন্তু এখন যদি ডাঙ্গর আই তাকে একটা রাত্রিও

আশ্রয় দেয় তারপরে মাতালু কি আর কলঙ্ক ছড়াতে পারবে? ডাঙ্গর আইকেও তো অনুরোধ করা যেতে পারবে মাতালুকে নিষেধ ক'রে দেয়ার জন্যে। আকস্মিকভাবে ডাঙ্গর আই-এর কাছে অভিমান জানানোর মতো মনের অবস্থা হ'লো তার।

বহুদিন এমন গভীর ক'রে সে চিন্তা করে নি ডাঙ্গর আই-এর কথা। আজ আশ্রয় হিসাবে চিন্তা করতে গিয়ে অনেক স্মৃতি জেগে উঠলো লখাই-এর মনে। সেই মৃদুভাষিণী মেয়েটির এখন বয়স হবারই কথা। প্রায় প্রৌঢ়া হ'লো সে। তা হ'লেও অমন যে সুন্দরী ছিলো সে কি এত তাড়াতাড়ি বিকৃতরূপা হয়েছে। এই ক্লান্তি, এই বিপন্নতার তুলনায় তার আশ্রয়কে শান্তির স্বর্গ ব'লে মনে হ'তে লাগলো লখাই-এর। কি স্নিগ্ধ সমাদরই ছিলো তার।

শুধু মাতালু নয় কাঁকরুর উপরেও যথেষ্ট প্রভাব আছে ডাঙ্গর আই-এর, নিন্দা-পরিবাদের গুঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে যাবে ডাঙ্গর আই যদি একবার মাত্র তাকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এখন কি সে তার সব দোষ ক্ষমা করবে? এবং তা এতদিন পরে?

আর একসাইজের ব্যাপারে দুখিয়ার কুঠিতে একটি পরিবারের কিছু দুর্বলতা আছে। ডাঙ্গর আই রাজধানী থেকে একটা নেশা নিয়ে এসেছিলো—সেটা মদের। রাত্রিতে শুতে যাবার আগে তখনকার দিনেও দু'তিন চামচ মদ না হলে চলতো না তার। এখন সে মদ তৈরি করে রংবর। আর এই দুর্বলতা আছে এটা যদি ডাঙ্গর আই-এর মনে বদ্ধমূল ক'রে দেয়া যায় হয়তো লখাইকে গ্রহণ না-করার পক্ষে তার প্রতিরোধ কিছু দুর্বল হবে। একই অপরাধে অপরাধী দু'জন।

দু-তিনবার শাখানদীটার দু'পারে লুকোচুরি খেলা হয়েছে। কাঁকরুদের সঙ্গে তার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। এর পরে ইচ্ছা

থাকলেও আর দুখিয়ার কুঠিতে গিয়ে পৌঁছাতে পাববে না সে। পা দুটো এত ভারি হয়েছে যে প্রতি পদক্ষেপে গতি কমে যাচ্ছে তার। আর দশ মিনিট, আর পাঁচ মিনিট। তারপরেই কাঁকরু তার বুকের উপরে ব'সে হাহা ক'রে হেসে উঠবে।

একবার তার মনে হ'লে এখানে দাঁড়িয়েই সে ঘোষণা করবে ডাঙ্গর আই-এর সঙ্গে তার পূর্ব সম্বন্ধের কথা।

মাতালু দেখলো লখাই আর পারছে না। এদিকে কাঁকরুর চোখেও একটা তীব্রতা দেখা দিয়েছে। সে তার কাঁধ থেকে গুড়াল বাঁশ হাতে নিয়েছে। যদি লখাই ধরা না দেয় তাকে আহত ক'রেও ধরবে এই তার উদ্দেশ্য ব'লে মনে হয়।

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় মাতালু দেখতে পেলো লখাই আবার নদীর জলে নামলো। নদীর এপার ওপার ক'রে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে তবু যেন অভ্যস্ত কোন পাঠের আবৃত্তির মতো লখাই তাই ক'রে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেরাও। দু'পক্ষই যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষ যেন নয় আর।

ইতিমধ্যে মাতালু ও লখাই একবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলো। বজ্রমুষ্ঠিতে মাতালু লখাইএর গলা চেপে ধরেছিলো। গভীর অরণ্যের এই অন্ধগলিতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাণীর মতো বর্তমানের হিংস্র উল্লাস ছাড়া আর কোন অনুভবই ছিলো না তাদের তখন। হঠাৎ লখাই সেই নীরবতার মধ্যে আর্তস্বরে কি ব'লে উঠেছিলো। তখন আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় তার সমগ্র চেতনা সমস্ত দৈহিক শক্তি একাগ্র হ'য়ে আর্তনাদটাকে সৃষ্টি করেছিলো। নতুবা অত স্বল্প কথায় এত গভীর এত তীব্র ক'রে এতখানি সংবাদ দেয়া যায় না। লখাইর গলা থেকে মাতালুর বজ্রমুষ্টি শ্লথ হ'য়ে গিয়েছিলো, সে স'রে এসেছিলো। লখাই কিছুক্ষণ প'ড়ে থেকে পরে উঠে পালিয়েছিলো আবার।

কেমন যেন একটা গোলমাল লাগছে মাতালুর। সব কিছু মিলে তাকে যেন বুদ্ধিহীন ক'রে দেবে। মালতীর স্বামী লখাই, এই কথাটাই তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই মৃদু আলোর চার দেয়ালের মধ্যে মালতীর কাছে অবাধ গতিবিধি যার। একটা বিদ্বেষ পোষণ করার ইচ্ছা হচ্ছে মনে, পরক্ষণে সেটা মিলিয়েও যাচ্ছে। মালতী সভ্যতা সম্বন্ধে ফিসফিস ক'রে কি সব ধিক্কার দিয়েছিলো সেই রাত্রিতে, তার কথাও মনে হচ্ছে। সভ্যতার একি চোরাবালির মতো ব্যবহার।

লখাই নদীর মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লান্ত শেয়ালের মতো তার দৃষ্টি। নদীখাতে জল নেই, চকচকে বালি, কোথাও বা এক হাঁটু জল। জল বাঁচিয়ে পার হ'য়ে যাচ্ছে লখাই, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মাতালুর মনে হ'লো, দিশি ভাষায় লখাই কেন তাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করলো? আত্ম-রক্ষার ছল? কিন্তু অন্য কোন ছলনা কি তার ভাটিয়াসুলভ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উদ্ভাবন করতে পারলো না? আর কি বোকা সে, আর্তনাদ শুনে তার মুঠি খুলে গেলো। তা বোধ হয় ভালোই হয়েছে। নতুবা হয়তো নরহত্যা ঘটে যেতো।

মাতালুই আগে আগে চলছিলো। সে এসে নদীর পারে দাঁড়িয়েছিলো। কাঁকরু সেখানে পৌঁছেই নদীখাতে নামবার জন্য পা বাড়ালো।

মাতালু বাধা দিয়ে বললো, রইস।'

'কেনে? চোর ভাগি যায়।'

'যাউক কেনে।'

অবশ্য চোরের আর পালানোর ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া মাতালু ইচ্ছা করা মাত্রই গুড়াল বাঁশ হাতে নিয়ে তার পালানো একেবারে বন্ধ ক'রে দিতে পারে।

মাতালু ভাবলো: কমলাকে নিয়ে ভালোই ছিলো সে। আকস্মিকভাবে মালতীর দেখা পেল আবার। কিন্তু কি ভাববে সে। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

'ভাবিস কি, নে গুড়াল বাঁশ, মারি দে।'

মাতালু হাসলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো কাঁকরুর হাত থেকে লখাইকে বাঁচাতে হবে। সে কাঁকরুকে মিথ্যা ক'রে বোঝালো ঘোরাপথে গিয়ে আকস্মিকভাবে লখাই-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

লখাই ওপারে উঠে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হেঁটে চলছে। মাতালু ঘোরা পথে পশ্চাদ্ধাবনের ভান ক'রে দৌড়ুতে সুরু করলো নদীর খাত বেয়ে। মাতালু আগে, পিছনে কাঁকরু। লখাইকে ভয় দেখানোর জন্য যেন সে একবার হো-হো ক'বে হেসে উঠলো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না সে কি করা উচিত তার।

আকস্মিক আর্ত চিৎকারে কাঁকরুর বুক হিম হ'য়ে গেলো। নদীর বুকে এখানে ওখানে ছোটো ছোটো কাশের ঝোপ। তারই একটার আড়াল থেকে মাতালুব আর্ত চিৎকার আসছে।

'কাঁকরু রে মোক বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।'

কাঁকরু ভাবলো প'ড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে মাতালু।

'আইসং, ভাই, আইসং।'

দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কে বেদনায় স্তব্ধ হ'য়ে গেলো কাঁকরু।

এদিককার পাহাড়ী নদীগুলির খাতে এখানে-ওখানে চোরাবালি থাকে। দূর থেকে দেখে বালির চড়া ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে চোরাবালিতে হাতি পড়লে তারও বাঁচোয়া নেই।

কোমর অবধি ডুবে গেছে মাতালুর। দুই হাত মেলে সে শূন্যে আশ্রয় খুঁজছে, কাঁদছে, আর্তনাদ করছে।

কাঁকরু চেষ্টা করলো গায়ের কম্বল ছুঁড়ে মাতালুর হাতে

পৌঁছে দিতে। সে নিজে নামলো খানিকটা চোরাবালিতে, কিন্তু উঠে আসতে হ'লো তাকে। মাতালু হাহাকার করছে, 'বন্ধু রে, কাঁকরু রে বাঁচা মোক বাঁচাও।'

কয়েকটা মুহূর্ত। হঠাৎ আর্তনাদ থেমে গেলো মাতালুর। সে কাঁদতে লাগলো 'মা রে, মা রে, তোর মাতালু গেইছে। আজা রে, গেইছে তোর মাতালু।'

বুক পর্যন্ত তলিয়ে গেলো মাতালুর। একটা বিস্ময় ফুটে উঠলো তার চোখে। একেই মৃত্যু বলে? সে স্থির হ'য়ে গেলো। চোরাবালি তার কাছে নতুন নয়। অনেক কাহিনী সে শুনেছে।

কাঁকরু কথা হারিয়ে ফেলেছে। সুস্থ সবল মাতালু। একটা চোখ লখাই-এর আঘাতে ফুলে আছে। তা সত্ত্বেও এত সুন্দর যেন কখনই মাতালুকে আর দেখায় নি, আজকের এই ম্লান চাঁদের আলোয় যেমন দেখাচ্ছে।

কিছুই করার নেই, কিছুই করার নেই।

অনেক কথা উঠে আসছে মাতালুর মনে। তার ঠোঁট কাপছে, ফুলে ফুলে উঠছে। বোধ হয় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে; বুক ওঠানামা করছে, থরথর ক'রে কেঁপে উঠছে। বোধ হয় তার মস্তিষ্ক অবশ হ'য়ে পড়েছে। নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার।

মাতালু বললো, 'বন্ধু রে, মোর ছাওয়া আছে নাকি জলপরীর ঘর?'

গলা পর্যন্ত ডুবে গেছে মাতালু।

রাত্রিশেষে কয়েক গুচ্ছ কাঁচা কাশফুল মাতালুর সমাধিতে ছড়িয়ে কাঁকরু ফিরে চললো তুখিয়ার কুঠিতে। তার শেষ কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে। নিজেকে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে দেখলে এই বোধ হয় মনোভাব হয় মানুষের। নিজের চিহ্ন রেখে যেতে সাধ যায়। কিন্তু কি খোঁজ নেবে কাঁকরু! মাতালুর জলপরী যে কমলা তা সে জানে।

বহুসেবিকা সেই সব নাবীর প্রেম এবং দেহ সমান বন্ধ্যা হওযাই স্বাভাবিক।

দুখিয়ার কুঠিতে ঢুকবাব আগে কাঁকরু নিজেব চোখ দু'টি ভালো ক'রে মুছে নিলো। খববটা দিতে হবে। সে চোখ তুলে চাইতে পারছে না। তবু তাব চোখে পডলো গদাধরেব ব্রিজের মাথায চড়ানো আলো যা এই সকালেও জ্বলছে। ঢং ঢং ক'বে ঘণ্টা বাজছে মজুরদেব কাজে ডেকে। তাব শব্দ যেন কানে এলো। পুবো দস্তুব শহরের কলেব বাঁশিব মতো বোলাব ইঞ্জিন কযেকটি একসঙ্গে তীব্র চিৎকার ক'বে উঠলো।

কাঁককর পাশ দিযে আন্তাজদেব মতো কযেকজন খালি ঝাঁকা মাথায় চ'লে গেলো। শহবেব জন্য আনাজ তবকাবী সংগ্রহ কববে তারা। ইতিমধ্যে গ্রামেব পথে পথে তাবা ছড়িযে পডছে।

মাতালুদেব বাড়িতে ঢুকতে গিযে আর্তকান্নায ভেঙে পড়ার প্রবণতা দেখা দিলো তার মনে। কথা হাবিযে যাচ্ছে। দুঃখের সীমাহীনতাকে ধবাব পক্ষে কোন হাহাকারই যথেষ্ট নয আব।

মাতালুব ঘবেব দবজায দাঁড়িযে দেখতে পেলো কাঁকরু মাতালুব বিছানার উপবে ব'সে আছে লখাই চক্রবর্তী। হাসিহাসি মুখ তার। ক্লান্তির অবসাদ নেই। সে বোধ হয রাত্রিব অবশিষ্ট সমযটুকু ঘুমিয়ে নিয়েছে। একটা আকস্মিক ক্রোধ কাঁকরুকে যেন বিদীর্ণ ক'রে দেয়ার জন্য তাব বুকেব মধ্যে চাপ দিতে লাগলো।

কিন্তু একি—একি? চোখকে কি অবিশ্বাস করতে হবে। ডাঙর আই এসে দাঁড়ালো লখাই-এব কাছে। তার মুখেও হাসি। সে মুখ যেন ব্রীড়াতেও সুন্দব হ'যে উঠছে। এই সকালেই যেন কিছু কিছু প্রসাধন কবেছে ডাঙব আই। একটা তৃপ্তির আনন্দ যেন ডাঙর আই-এর দৃষ্টির স্নিগ্ধতাকে ঝকঝকে ক'রে তুলেছে।

কাঁকরু জানতো কোন এক পুরুষকে স্নেহ করতো ডাঙ্গর আই লখাই কি সেই দুর্লভ ভাগ্যবান ?

ঘরের এক কোণে আলনায় মাতালুর প্যাণ্ট ও সার্ট মৃদু হাওয়ায় দুলছে। যেন অসহায় তারা।

কাঁকরুর মুখে যে লবণাক্ত স্বাদ সেটা কি হিংসার না তার কান্নার!

তার মনে হ'তে লাগলো ডাঙ্গর আই-এর এ সুখস্বপ্ন কি পুড়ে যাবে না মাতালুর সংবাদ শোনামাত্র। কাঁকরুর বুকের মধ্যে কে যেন বারংবার বলছে—প্রতিশোধ নাও, ঝাঁপিয়ে পড়। কিন্তু অবাকও লাগছে ডাঙ্গর আই-এর মুখের প্রশান্ত আনন্দ দেখে।

হঠাৎ যেন রংবরের আদিম স্থবিরতার আত্মা একটা কুয়াশার মতো আবৃত করলো, আত্মস্থ করলো কাঁকরুকে। কাঁকরু দেখতে পেলো স্থবির রংবর গোরুগুলোকে খেতে দিচ্ছে। কোন কোনটিকে আদরও করছে। কাঁকরুর মনে হ'লো কি হবে দুঃসংবাদ দিয়ে ডাঙ্গর আইকে ? কি লাভ প্রতিশোধ নিয়ে লখাই চক্রবর্তীর উপরে ? যে গেছে সে তো আর ফেরে না। একটু ক্লান্তি যেন নামছে কাঁকরুর রক্তে। একটা স্নিগ্ধ বেদনার কান্না যেন তার রক্তপ্রবাহে মিশতে সুরু করেছে।

আই কাঁকরুকে দেখতে পেয়েছিলো।

'কি রে কাঁকরু ?'

কি সুন্দর দেখাচ্ছে আই-কে। যেন কোনদিনই তার প্রিয়-বিচ্ছেদ হয় নি, এমনি ধীর সস্নেহ সলজ্জ তার ভঙ্গি।

'মাতালু ভাগি গেইছে।' হাসার চেষ্টা করলো কাঁকরু।

'কোটে গেইল ?'

'ইদি'। পুব দিক দেখিয়ে দিলো কাঁকরু। কি লাভ কারো শান্তিকে বিস্মিত ক'রে!

আই ভাবলো হ'তে পারে, শহরের সেই মেয়েটির মনোরঞ্জনের জন্যই হয়তো তাকে নিয়ে পর্যটনে বেরিয়েছে মাতালু। এমন ঘ'টে থাকে।

পুত্রপৌত্রাদির কথা স্পষ্ট ক'রে মনে না হ'লেও সস্নেহ কৌতুক বোধ করলো সে। সে লখাই-এর দিকে চাইতে পারলো না যেন লজ্জায়।